নানা রঙের দিনগুলি

নানা রঙের দিনগুলি

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

বাক্‌-সাহিত্য
৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ—ভাদ্র, ১৩৭২ বাং

প্রকাশক :
শ্রীস্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়
বাক্-সাহিত্য
৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :
সত্যপ্রসন্ন দত্ত
প্রাচী প্রেস
৩২ পটলডাঙা স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট :
শ্রীসূর্য্য রায়

॥ এক ॥

স্কুল থেকে এসেই চিঠিটা পেলো সে। বিকেলের ডাকে এসেছে। বিকেলের ডাকেই আসে। নিয়মিত। মাসে তিন-চারটে।

নীলচে খাম। তার উপর রয়্যাল ব্লু কালিতে গোল-গোল হরফে ঠিকানা লেখা: সুপ্রীতি চন্দ। সানি কট। ১২-বি দেবেন ঘোষ রোড। কলিকাতা। দিল্লীর সীল।

ভাস্বতীর চিঠি। কোনো তাড়াহুড়ো নেই। আরামে পড়ার চিঠি, সুপ্রীতি জানে।

শাড়ি-ব্লাউজ পাল্টাল। হাত-মুখ ধুয়ে এসেও দেখলে, গীতা ফেরেনি। কোথায় যায় ও ছুটির পর! এক ঝলক হাওয়ার মতো ভাবনাটা ছুঁয়ে যায় সুপ্রীতির মন। পর মুহূর্তেই আর মনে থাকে না। গীতা যেখানেই থাক, তার চা চাই। ঝিকে চায়ের হুকুম জানিয়ে পায়ের উপর পা তুলে চেয়ারে বসল সুপ্রীতি। যা প্রায় সব টীচারেরই বসবার রীতি।

ভাস্বতীর কাছে সুপ্রীতির চিঠি গেছে প্রায় সাত দিন হবে। তারই উত্তর। খামটা হাতে নিয়েও খুলল না সুপ্রীতি। তাকিয়ে রইল। বিকেলের আকাশের মতোই নীল খামটা। ভাস্বতীর এই নীলচে খাম এলে সুপ্রীতির মনে হয়, আকাশের মতো খামের মতো দিনটাই বুঝি নীল। তার যদি একটা নীল শাড়ি থাকত, পরত সে এখন। তা যখন নেই, গুনগুন করে গাইল সুপ্রীতি: "দাও আকুলিয়া ঘন কালো কেশ, পরো দেহ ঘিরি মেঘ-নীল বেশ।" মোটের উপর, সময় কাটাতে লাগল সে হেন-তেন করে। চায়ে চুমুক না দিয়ে চিঠি খুলবে না।

ঝিকে ডাকল সুপ্রীতি: "মিনি, তোমার হল?"

ঝির নাম কামিনী। কিন্তু তা এম্নি সেকেলে যে 'সানিকটে'র

নানা রঙের—১

বাসিন্দেরা হেসে আকুল। একটু ছাঁটাই করে তাই নামটাকে মিনি করে নিয়েছে তারা।

কামিনীর জবাব এলো না। হয়ত সে জানে, এ-দিদিমণি মেজাজ করেন না, তাই নিরুত্তরে চা তৈরী করতে লাগল।

ভাস্বতীর কথায়ই মন নিয়ে গেল সুপ্রীতি আবার। পাঁচ বছর তার সঙ্গে এই চিঠিতে আলাপ চলছে। বিয়ের পর যখন টীচারি ছেড়ে নিউ দিল্লী চলে গেল ভাস্বতী তখন থেকে। কাউকে কাউকে এমন ভালো লেগে যায়—যেমন ভাস্বতীকে! ভাবে সুপ্রীতি। একসঙ্গে মাত্র ত দু'বছর টীচারি করেছিল তারা। তাতেই। নাগাড়ে চার বছরও ত অনেকের সঙ্গে পড়েছে সুপ্রীতি, কিন্তু ভাস্বতীকে যেমন ভালোবাসতে পেরেছে তেমন ত কাউকে বাসে নি। ভারি স্নিগ্ধ মেয়ে। তেমনি স্নিগ্ধ তার চিঠির খামের রঙ।

প্রথম হেমন্তের বিকেল। আকাশের নিটোল নীল দেখে মনে হয়, ওটা অন্য কোনো নীল নয়, নাইট্রোজেন অণুর ঝাঁক বুঝিবা তাদের নীল আলো ছড়াচ্ছে।

পাশের ঘরে লতিকার আর তৃপ্তির হৈ-হৈ। গয়লা বুঝি ওদের দুধ দিয়ে যায়নি আজ। বিরক্ত হয়ে ভাবে সুপ্রীতি, আকাশ দেখতে পারে না ওরা? এমন সুন্দর আকাশ! সুপ্রীতি গালের ওপর নীল খামটা চাপতে সুরু করে।

বয়েসটা যদিও হাল্কা নয় সুপ্রীতির, আটাশ, কিন্তু হাল্কা মন আট-দশের। যখন মন গড়ে উঠতে থাকে সে-সময়টায় যখন সুপ্রীতি, দেশ তখন স্বাধীন হলো। দাঙ্গার দুর্যোগ ছিল। তবু নিশ্চিন্ততা গড়ে উঠল ক্রমে। বলতে গেলে নিশ্চিন্ত আবহাওয়ায় সে মানুষ।

সমান বয়েসী যদিও ভাস্বতী, সে ছিল যেন একটু অন্য ধরনের। মা মারা গেছেন ছেলেবেলায়, বাবার সঙ্গে মানুষ। সবকিছু একটু তলিয়ে বুঝবার অভ্যাস ছিল যেন তার। বিয়ের আগে সে সুপ্রীতিকে বলেছিল: "আমি বিয়ে করছি কিন্তু তোমারও একদিন ইচ্ছে হবে বিয়ে করতে।" মাথা দুলিয়ে বলেছিল সুপ্রীতি: "বিয়ে করব না

এমন পণ ত আমার নেই। এখন ইচ্ছে নেই। চাকরি করব। দেখি কেমন লাগে। দিদির বিয়ে ত দেখেছি। ওঃ, কী ভীষণ! একপাল ছেলেমেয়ে!"

তারপর পাঁচ বছর ত চাকরি হয়ে গেলো, বিয়ের ইচ্ছে তার একটুও হয়নি। কেষ্টনগর থেকে বাবা-মার চিঠি আসে, প্রায় প্রত্যেক চিঠিতেই ঘুরে ফিরে এ জিজ্ঞাসাটা থাকে, সুপ্রীতির বিয়ের ইচ্ছে আছে কি না। মাঝে-মধ্যে পাটনা থেকে দিদির যে চিঠি আসে তাতেও এ পংক্তিটা বাদ পড়ে নাঃ "বিয়ে আর কবে করবি!" উত্তরে একবার লিখেছিল সুপ্রীতিঃ "ওগো, কেষ্টনগরের পুতুল, এক চিঠিতেও ত লেখোনা, তাজমহল আর কবে দেখবি?"

যা হোক, বাড়ির চিঠি এলে দিনটা রঙ ঢালতে সুরু করে না, যেমন করে ভাস্বতীর চিঠি এলে। খবর বলতে তেমন কিছু থাকে না, তবু যেন কতো কি পাওয়া যাবে এন্নি আশা থাকে সুপ্রীতির।

ভাস্বতীর চিঠির শেষে প্রায়ই তার স্বামী শমীনের কয়েকটা পংক্তি থাকে। যেমনঃ "দিল্লী আসুন না একবার! শুনেছি তাজ দেখবার আপনার খুব শখ। সবাই মিলে যাওয়া যাবে আগ্রা।" যদিও মাত্র বিয়ের সময়ই সুপ্রীতি দেখেছে শমীনকে তবু এই পাঁচ বছরে টুকরো চিঠির মধ্য দিয়ে অনেক পরিচিত হয়ে উঠেছে সে, যেন আত্মীয়ের মতোই কেউ।

আজকের চিঠিতেও হয়ত তেমন নিমন্ত্রণই আছে! পুজোর ছুটিটা গেল। গীতা কণ্ডাক্টেড্ টুরে কতো জায়গা ঘুরে এলো—সুপ্রীতি গেলেই পারত দিল্লী। তা না, কৃষ্ণনগর গেল সে! মা ত সারা ছুটিটাই ঘ্যানর ঘ্যানর করলেনঃ এখানকার গার্লস্ স্কুলে কি চাকরি হয় না! তার মানে, সবসময় কাছে রেখে বিয়ে-বিয়ে করে কান ঝালাপালা করবেন। ফলে দিদির মতোই পুতুল।

হঠাৎ মনে হল সুপ্রীতির, অনেকক্ষণ হয়ে গেল, অনেক কথা ভাবছে সে, কিন্তু মিনি ত চা নিয়ে এলো না! আর ঠিক এন্নি সময়ে গীতা এলো।

"এতোক্ষণ কী করছিলে?" শরীর দুলিয়ে বললে সুপ্রীতি "হেডমিষ্ট্রেসের সঙ্গে গোপন পরামর্শ?"

গীতা কম কথা বলে: 'হুঁ' বলে বেশ পরিবর্তনে মন দিলে।

এ সময়ে স্কুল-পলিটিক্স হয় খানিকটা। ঘণ্টা খানেক আলাপ চলে। কিন্তু আজ হল না। সুপ্রীতিরই ইচ্ছে হল না আর সে আলোচনায় যেতে। সে ত রোজই আছে। রোজ ত আর ভাস্বতীর চিঠি আসে না।

আবার ডাকলে সে কামিনীকে: "মিনি, গীতাদিদিমণি এসেছেন, দু' কাপ চা-ই আনো।"

কিন্তু কামিনী তখন এক কাপ চা আর এক প্লেট আলুভাজা নিয়ে পৌঁছে গেছে। তা হলে বা কী? বল্‌লে: "জল চাপানোই আছে, করে দিচ্ছি গীতাদিদিমণির চা।"

গীতা বিছানায় বসে চুল খুলছিল। সুপ্রীতি তাকে খামটা দেখিয়ে বললে: "গীতা, ভাস্বতীর চিঠি এসেছে।"

শক্ত ঠোঁট খুলল গীতার: "সে আর নতুন কী?" আবার ঠোঁট শক্ত হল।

"তোমার কাছে ত সবই পুরনো হয়ে গেছে!"

গীতার দিকে আর মন দিলে না সুপ্রীতি। চায়ে চুমুক দিয়ে খাম ছিঁড়ে চিঠির ভাঁজ খুললে।

"প্রথমেই তোমাকে একটা সুখবর দিচ্ছি, সুপ্রীতি, আমরা শীগগীরই কলকাতা আসছি—"

আনন্দে এক মুঠো আলুভাজা মুখে পুরে সুপ্রীতি সশব্দে চিবুতে চিবুতে আবার পড়লে:

"উনি ন্যাশন্যাল আরকাইভ্‌সের চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন—কলকাতার মিউজিঅমে একটা ভালো অফার পেয়ে। পিকলু ত সবসময়ই বলছে: মাসীকে কবে দেখব, মা?..."

ভাস্বতীর চার বছরের ছেলে পিকলুকে দেখেনি সুপ্রীতি। দিল্লীতেই ওর জন্ম। ভাস্বতীকে লিখেছিল: "দিল্লীওয়ালা পিকলুর একটা ফটো

পাঠিয়ে দিও ত!" ঠোঁটে ঠোঁট চাপা পিকলুর সেই ছবি দেখে সুপ্রীতি জানিয়েছিল: "এ যে দেখছি বঙ্কিমচন্দ্রের মতো ঠোঁটচাপা মানুষ। আমাদের বাংলা সাহিত্যে এখন যা হরিলুট চলেছে, তাতে সত্যি একজন বঙ্কিমচন্দ্রের দরকার। তুমি ত পড়াও পিকলুকে। ওর সাহিত্যের মেজাজ তৈরী করে দিও।" "তুমি ত পড়ো রম্যরচনা—বঙ্কিমচন্দ্রের তোমার কী দরকার?"—উত্তরে লিখেছিল ভাস্বতী।

"সব বিদ্যে চুলোয় গেছে বুঝি তোমার? বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের দপ্তর রম্যরচনা নয়?" সুপ্রীতির চিঠি।

"হ্যাঁ আমি পাকা রাঁধুনী হতে শিখছি।" ভাস্বতীর উত্তর।

চিঠি থেকে চোখ সরিয়ে নিয়েছিল সুপ্রীতি, আবার চিঠিতে মন দিলে:

"শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীটে পিশেমশাইর বাড়ির দোতলার ফ্ল্যাটটা আমরা নেবো। তিনটে বাসযোগ্য ঘর। একটা বসবার ঘর, আরেকটা শোবার আরেকটাতে তুমি থাকবে? ওঁর আর আমার ইচ্ছে তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো..."

কথাগুলোতে খুশী হল, না চমকালো সুপ্রীতি, বোঝা গেল না। বারবার চায়ে চুমুক দিতে লাগল। ভাস্বতীর বিয়ের আগে ছুটিছাটায় দু'একদিন ভাস্বতীদের বাড়ি গিয়ে থেকেছে সুপ্রীতি। সেই সুন্দর সঙ্গ, সুন্দর স্মৃতি হয়ত মনে পড়ল তার। বাড়িতে ভালো না লাগুক কিন্তু একথা সুপ্রীতি মানে যে পারিবারিক বেষ্টনীতে না থাকলে মেয়েদের মেয়েলিভাবটা নষ্ট হয়ে যায়। শত স্বাধীনই হোক, মেয়েরা ত আর পুরুষের মতো নয়, তাদের একটা স্বাতন্ত্র্য আছে। তা-ই মেয়েলিভাব।

গীতাকে কখন চা দিয়ে গেছে কামিনী, তা সুপ্রীতি লক্ষ্যই করেনি। চা শেষ করে গীতা বললে: "কী খবর ভাস্বতীর?"

"ভাস্বতীরা কলকাতা আসছে। আজ বিকেলটা এমন সুন্দর লাগছিল, তাই আজ এ সুখবর পেলাম।" চিঠিটা ভাঁজ করে খামে পুরে বললে সুপ্রীতি।

"রম্য দেখা ত তোমার স্বভাব—রম্যরচনা পড়ো যখন।"

"একেকদিন দেখা। আজ তোমাকেও রম্য দেখাচ্ছে। কেন বলো ত?"

"মোটেও দেখাবার কথা নয়। ফ্রেশ হতে পারছিনে। বাথরুমে কৃষ্ণা ঢুকেছে। একটি ঘণ্টা নেবে।"

চেয়ার ছেড়ে বিছানায় এলো সুপ্রীতি। চিৎপাত শুয়ে জানালায় তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর যেন আপন মনেই বললেঃ "ভাস্বতী এলে হয়ত ওর বাড়িতেই থাকব আমি। 'সানি কটে'র বাস উঠল!"

গীতা পায়চারি করছিল, থেমে বললেঃ "তুমি গেলে আমি আশঙ্কায় থাকব।"

"কেন?" একটু গম্ভীর হয়ে গেল সুপ্রীতি।

"সুষমাদি কা'কে এনে এ ঘরে জোটান কে জানে!"

"ওঃ।" হাসল সুপ্রীতি। না, তার কোনো অশুভের ইঙ্গিত করছে না গীতা। মনে-মনে সে চমকে উঠেছিল অনর্থক।

॥ দুই ॥

হরিশ মুখার্জি রোডের একটি মেয়ে-স্কুলের টীচাররা মিলে দেবেন ঘোষ রোডে এই মেসটি করেছেন। নাম রেখেছেন 'সানি কট'। একতলায় চারখানা ঘর, তাছাড়া খাবার ঘর, ভাঁড়ার, রান্না ঘর ত আছেই। সবকিছু দেখাশোনার ভার নিয়েছেন সুষমা ঘোষ। অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট-হেডমিষ্ট্রেস। বয়েস পঁয়ত্রিশ, বাসিন্দেদের সবার দিদি। গোলগাল, হাসিখুশী মানুষ। বিয়ে করেন নি—বাপ-মার অভাবের সংসার তাই। ভাইরা সব ছোট। তারা বড় হতে হতে চল্লিশ পেরিয়ে যাবে তাঁর। তাই বিয়ে যে ভবিষ্যতেও হতে পারে সে আশা করেন না। বাড়িতে নিয়মিত টাকা পাঠান। চাকরি তাঁর সময় কাটাবার উপায় নয়, স্বাতন্ত্র্য রক্ষার উপায় নয়, নেহাৎই প্রয়োজন। টীচারিতে ঢুকে তিনি এম-এ পাশ করেছেন ইংরেজিতে, বি-টি পাশ করেছেন।

ভারতের শেষ স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় বয়েস তাঁর চোদ্দ-পনেরো ছিল। মনে তার হাওয়া লেগেছে এবং গভীর ছাপ রেখে গেছে। গান্ধীজিকে, আজাদ হিন্দ ফৌজদের দেখবার কী আগ্রহই না তাঁর ছিল! কতো মূল্য দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা, তার কথা তাঁকে শোনাতেন তাঁর বাবা। বাবা ছিলেন উকীল। দু'দুবার স্বদেশী করে প্র্যাকটিস নষ্ট করেছেন। সিউড়িতে আছেন।

সুষমাদির স্বভাবে হাল্কামি নেই। স্কুলের সব টীচার তা জানে। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ না করে হেডমিষ্ট্রেস কোন কাজ করেন না। কাজে তাঁর আলস্য নেই এতোটুকু—হেড-মিষ্ট্রেসের অনেক কাজই তিনি হাসিমুখে করে দেন।

ঘরেব কাজেও বা কি? একটু ইতস্তত নেই তাঁর। তিনি গৃহ-কর্ত্রী বলেই বাড়ির আবহাওয়ায় এখানে মেয়েরা আছে। ঝি-কে সঙ্গে নিয়ে রোজ তার জগুবাবুর বাজারে যাওয়া চাই। কোথায়

সস্তায় ভালো জিনিষ পাওয়া যাবে তা তাঁর নখদর্পণে। যেমন, পার্ক সার্কাসে মাংস, জানবাজারে মসলা।

মোটের উপর সুষমাদি কমবয়েসী টীচারদের মতো মোটেও অলস, আরামী নন। অনেকেই ত টীচারি করছে বি-এ পাশের পর হাতে সস্তা পাওয়া যাচ্ছে বলে এই কাজ! আর্ধেক টীচারই অন্য হাত ধরে পালাতে পারলে বাঁচে। কিন্তু বই হাতে পড়ানোটা সুষমাদির আদর্শ।

সকাল বেলা এক সঙ্গে চায়ে বসে বলেন তিনি: "জানো, স্বাধীন ভারতে নতুন শ্রেণী বলতে টীচারদেরই বোঝায়। স্বাধীন ভারতে লক্ষ লক্ষ স্কুল হচ্ছে—এ শুধু বেড়েই চলবে। লক্ষ-লক্ষ স্কুলের লক্ষ লক্ষ টীচাররা মিলে এখন একটা শ্রেণী। তা-ই না? আগেকার দিনে যে অনুকম্পার পাত্র ছিলেন টীচাররা, এখন আর তা নয়। তাঁদের মান মর্যাদা-স্বাচ্ছন্দ্য দেশের পক্ষে একটা বড়ো কথা। তাই দায়িত্বও তাঁদের বেশি।"

এসব গম্ভীর কথায় বাইশ থেকে আটাশ বছরের টীচাররা কান দিলেও মন দেয় না। তারা সবাই ভাবে, সুষমাদির জগৎ আলাদা। এক কৃষ্ণা তাঁর ঘরে থাকে, এম-এ পড়ছে। প্রাইভেট। কৃষ্ণাই শুধু সুষমাদিকে আদর্শ মনে করে। বাদ বাকি সব পারতপক্ষে সুষমাদির ঘরেই যেতে চায় না। কিন্তু তাঁর হাসি মুখে খুশী নয় এমন কেউ নেই।

ইংরেজির সীনিয়র-টীচার তিনি। বক্তৃতার ভঙ্গীতে পড়ান। কথাও বলেন বক্তৃতার ভঙ্গীতে। চরিত্রে তাঁর ত্রুটি থাকলে ওটাই। মেয়েরা আজকাল ইংরেজিতে ভীষণ কাঁচা। যদিও নাটকীয় উচ্চারণে মজবুত। তাই ইংরেজি শেখাবার জন্যে তিনি যত্ন নেন প্রচুর। তিনি মনে করেন, ইংরেজির স্থান হিন্দি এসে দখল করবে বলেই ইংরেজি শেখায় মন নেই কারো। ইংরেজির পক্ষ নিয়ে কিছুদিন আগে কলকাতার সাহিত্যিক-অধ্যাপকরা যখন একটা আন্দোলন এনে সভা-সমিতি করছিলেন, সুষমা ঘোষ তাতে যোগ দিয়ে কয়েকটা সভাতেই বক্তৃতা করেছেন।

সুপ্রীতি কৃষ্ণাকে বলেঃ "সুষমাদি কংগ্রেসে যোগ দিয়ে কেন যে একটা উপমন্ত্রী-টন্ত্রী হচ্ছেন না, তা-ই ভাবি। বক্তৃতার যা ওঁর অভ্যেস ?"

কৃষ্ণা উত্তর দেয়ঃ "তুমি ত এতো রম্য-রচনা টচনা পড়ো। কেন যে একটা মুজতবা আলী হচ্ছ না, তা-ই ত আমি ভাবি !"

হয়ত সুষমাদিকে তখন আসতে দেখা যায়। ফলে দু'জনেই চুপ। কিন্তু দুটি শ্রোতা পাওয়ার সুযোগ হারান না সুষমা। বলেনঃ "জানো আমি ক'দিন থেকেই ভাবছি, স্বাধীনতার পর দেশের অর্থনীতিতে যে দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে, সে-অনুপাতে আমাদের মনেরও পরিবর্তন হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হচ্ছে না।"

হেসে সুপ্রীতি বলেঃ "পরিবর্তন ত দেখছি এক নয়া পয়সা। একশো পয়সায় এক টাকা। নইলে আর কী ?"

"দুর্গাপুর দেখেছ ? কী হয়েছে সেখানে ? আরো কী হবে জানো।" চেয়ার টেনে ক্লাশ করার ভঙ্গীতে বসেন সুষমাদি।

"লোহালক্কড় দেখতে দুর্গাপুর কেন, জামসেদপুরই ত ছিল।" সুপ্রীতি সুষমাদির উৎসাহ জল করে দিতে চায়।

"আসলে নতুনের দিকে তোমাদের নজর নেই।" মুখ ফিরিয়ে নেন সুষমাদি।

"আছে, সুষমাদি !" কৃষ্ণা বলেঃ "কনুইহাত ব্লাউজ বাতিল করে যেদিন হাতকাটা ব্লাউজ ফ্যাশান হল, সেদিনই সুপ্রীতি তা তৈরী করে নিয়েছে। এবং এখন উল্টো-গলা ব্লাউজ।"

হাসেন সুষমাদিঃ "থাক্, সুপ্রীতিকে কিছু বলো না। ও ত নাকি চলেই যাবে। কোন্ দিন শুনবে ওর বিয়ে—ভাস্বতীর মতো। তখন ত চিরদিনের জন্যেই গেল।"

আগেকার দিনের মতো এখনও যে মেয়েরা বিয়ের জন্যেই নিজেকে তৈরী করবে, সুষমা ঘোষ তা পছন্দ করেন না। মানুষ হিসেবে পরিবারের প্রতি, সমাজের প্রতি, দেশের প্রতি মেয়েদেরও একটা কর্তব্য আছে। বিয়েটাই আসল কর্তব্য নয়। জীবনকে একপেশে

করে রাখা ত অজ্ঞতা। টীচাররাই যদি এই অজ্ঞতায় ভোগেন তাহলে দেশের ভবিষ্যৎ তৈরী হবে কী করে!

পরের দিন চায়ের টেবিলে এসব কথা বলেন তিনি।

সুপ্রীতি ঘরে এসে গীতাকে বলে: "সকাল বেলাটা আমাদের চার্চে কাটে!"

"ক'দিন আর! তুমি ত পালাচ্ছই।"

"ভাস্বতী না এলেও হয়ত পালাতে হ'ত। রীতিমতো ওল্ড মেড হয়ে উঠেছেন সুষমাদি। সদালাপ ছাড়া থাকতে পারেন না।"

"তোমাকে বা সে আলাপ শুনতে না পারার রোগে ধরেছে কেন?"

সুষমা ঘোষ কথা বলেন সকালবেলা চায়ের টেবিলে আর ক্লাশ করবার সময়। তাছাড়া সারাদিনই ত কাজ। খাতা দেখার, চিঠি লেখার কাজ না থাকলে ঘরের খুঁটিনাটি ঝেড়ে-পুঁছে মেজে-ঘষে ঝকঝকে করে রাখেন। তা-ও যখন থাকে না, তখন ঢোকেন রান্নাঘরে। কোন্ ঋতুতে কোনটা খেতে হয় তা বোঝাতে সুরু করেন ঠাকুরকে। "গরমের সময়টাতে শুক্ত আর অম্বল-চাটনি করবেই। ভাজা-টাজা তখন নয়, শীতে আর বর্ষায়।" যেদিন মাংস আসে ঠাকুরকে সরিয়ে নিজ হাতে, তাঁর তখন আর বই নয়, রান্না করা চাই।

তার জন্যে লতিকা সুষমাদির উপর খুশী। তৃপ্তিকে বলে: "আর যা-ই বলো, সুষমাদির মতো আর কেউ মাংস রাঁধতে পারবে না, ভালো হোটেলের বাবুর্চিও না। আদা-পেঁয়াজ-রশুন ঝাল-নুন এমন ব্যালেন্সড্—যেমনি তাঁর চরিত্র তেমনি তাঁর রান্না।"

"তোমার ত খাওয়া হলেই সব হয়ে গেল।" তৃপ্তি বলে।

"পেটে খেলে পিঠে সয়, তা জানো না? সুষমাদি খাওয়ান ভালো তাই তাঁর বিরস বক্তৃতাগুলোও আমার হজম হয়ে যায়।"

বিরস বক্তৃতা মানে লতিকাকে পেলেই সুষমাদি বলেন: "শুধু একটা বি-এ ডিগ্রী নিয়ে এ লাইনে কী করবে? তার জন্যেও বলছি

নে, পড়াশুনো বড়ো সম্মানের কাজ। বসে বসে দিন কাটিও না, দিন মানেই জীবন। রাত্রিতে ত আমরা মরে থাকি।”

এখনও পড়েন সুষমা ঘোষ। কৃষ্ণা যখন সিক্সথ্ পেপারের অডেন-এলিঅট নিয়ে থৈ পায় না, তখন মাঝে মাঝে দেখা যায়, সমর সেট ম’মে তিনি নিবিষ্ট হয়ে আছেন।

॥ তিন ॥

রবিবার। সকাল থেকেই সুপ্রীতির ঘরে আড্ডা। এমন হয় না। সুপ্রীতি চলে যাবে তারই জন্যে যেন তার সঙ্গে শেষ মেলামেশা। কৃষ্ণা আসে নি। সুষমাদি তো মেয়েদের আড্ডায় অনধিকার প্রবেশ করেনই না। ছুটির দিনে, চায়ের পর তিনি হয়ত মাংস কিনতে পার্কসার্কাস ছোটেন, কিম্বা বন্ধু সুলেখা সেনের সঙ্গে দেখা করতে যান। সুলেখা আশুতোষে ইংরেজির অধ্যাপিকা।

সুপ্রীতি কৃষ্ণাকে নিয়ে পড়েছে ঃ "জানো, ওর রোগা চেহারাটা মাষ্টারিতে ঠিক মানিয়ে গেছে। মাষ্টারদের খিটখিটে হতে হয়, রোগারা খিটখিটে তাই।"

যোগ দেয় লতিকা ঃ "সুপ্রীতিদি, কৃষ্ণাদির নাকটা কেমন উঁচু দেখছ। ওঁর বিয়ে হলে দজ্জাল বৌ হতেন।"

"আর তৃপ্তি ?"

"তৃপ্তিদি এতো এলাচ খান যে বিয়ে হলে উনি পান-জর্দাখোর গিন্নী হয়ে উঠবেন।"

"না-না, ঝাঁজালো স্বভাবের জন্যেই ওই এলাচ।" গীতা বলে।

"ঝাঁজ না থাকলে এই ক্ষুধিত বীট গাজর কবির যুগে বাঁচা যায়!" তৃপ্তি বলে।

"আচ্ছা, লতিকা" সুপ্রীতি বলে ঃ "বিয়ে-বৌগিন্নী এসব কথায় তোমার খুব মজা, তাই না ?"

সবার চাইতে বয়েস কম আর দেখতে ভালো লতিকা, সুন্দর হেসে বলে ঃ "হ্যাঁ। বিয়ে হয়ে গেলে আমি বাঁচি।"

"তোমার সরলতার জন্যে তোমাকে ক্ষমা করা যায়—" সুপ্রীতি বলে ঃ "এমন কি, সিনেমার মেয়েদের ধরনে কানের পাশে চুল বাঁকিয়ে দেওয়াটা-ও। এমনকি টপলেস্ হলেও..." স্যুপে চুমুক দেবার শব্দে হেসে উঠল সুপ্রীতি।

ঘাড় হেলিয়ে থাকা গীতার সহজ ভঙ্গী—হেলান ঘাড় সোজা করে সে বলে : "আকাশচারিণী তৃপ্তির সঙ্গে যে থাকে সে সিনেমা তারার ফ্যাশান ধরবে না? ছবিতে কবে নামছ তৃপ্তি?"

"আমি ত সিনেমায় চান্স পেলেই যাবো।" তন্বীশ্যামা তৃপ্তি বলে : "কিন্তু প্রত্যেক শনিবার বিকেলে তুমি কোথায় যাও, পথচারিণী? কোন্ লাভার্স নুকে?"

সুপ্রীতি লুফে নেয়, কথাটা : "বলো কী! যে গম্ভীর হয়ে চলেছে গীতা, আমি ত ভেবেছি হরিসভাটভায় বুঝি যেতে সুরু করেছে!"

"প্রেমে পড়লেও লোক গম্ভীর হয়, না গীতা?" তৃপ্তি মিহি হাসিতে মুখ ভরিয়ে তোলে।

তৃপ্তি যে ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেছে তার জন্যে খানিকটা বিব্রত বোধ করে গীতা। কিন্তু দেখাতে চায় বিরক্ত হয়েছে। ঠোঁট বুঁজিয়ে, ভুরু কুঁচকে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে। আসলে এবার কণ্ডাক্টেড টুরে বেরিয়ে প্রফেসর নিরঞ্জন বোসের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল। সে আলাপের সূত্রে এখন তারা ঘনিষ্ঠ। নিরঞ্জনের সঙ্গে গীতা প্রতি শনিবার মেট্রো, লাইট হাউসে না-হয় পার্ক-ষ্ট্রীটের নীলশেয়ালে যায়।

"যাক্, প্রেমে পড়া স্বাভাবিক—" তৃপ্তিকে বলে সুপ্রীতি : "তুমি যে নিজের প্রেমে পড়ে আছো! একটি কস্তুরী মৃগ। আপন গন্ধে পাগল!"

"যা বলেছ সুপ্রীতিদি—" মজা পেয়ে হাসতে থাকে লতিকা : "নিজের প্রেমে না পড়লে এতো পোজে এতো ফটো কেউ তোলে? তৃপ্তিদির অ্যালবাম ভর্তি নিজের ছবিতে।"

"সে আমার এক দাদার তোলা।" তৃপ্তি বলে।

"সত্যি দাদা, না পাতানো?" সুপ্রীতি কথা ছাড়ে না : "দুধ পাতলে দই হয়, দাদা পাতালে প্রেমিক!

গীতা সুযোগ পেয়ে বলে উঠে : "প্রেমে না পড়লে কি কেউ প্রেমের গন্ধ খুঁজে বেড়ায়?"

তৃপ্তি হেসে ওঠে : “গন্ধ আমি ঠিক পেয়েছি কিনা, তা-ই বলো।”

গীতা ট্রানজিস্টার খুলে দিয়ে শুয়ে পড়ে।

লতিকা বলে : “এসব তর্কের চাইতে গান ঢের ভালো। গীতাদি, ধন্যবাদ।”

গান চলে খানিকক্ষণ। তাই চুপ করে থাকতে হয় সবাইকে। গানের আবেদন দুর্বোধ্য, মেয়েদের মনও তা-ই। এ দু'টোর মধ্যে একটা সহজ যোগাযোগ আছে হয়ত সেই জন্যেই। কৃষ্ণা-ও ও-ঘর থেকে এসে সুপ্রীতিদের ঘরের দরজায় দাঁড়াল।

“তুমি ডিস্টার্বড্ ফিল করছ না কি, কৃষ্ণা?” সুপ্রীতি জিজ্ঞেস করলে।

“মোটেই না। গানটা ভালো লাগছিল, তাই এলাম।”

“ঘরে এসো, বোসো এসে।”

কৃষ্ণা ঘরে এলো আর সবাই যেন কেমন উস্‌খুস করে উঠল।

তিন চারজন মেয়ে এক সঙ্গে জুটলেই মজার মজার কথা হয় আর তাদের হাসির ঢেউ ওঠে। এদেরও সেই অভ্যেস। কৃষ্ণার কথা নিয়েই যতো হাসাহাসি এদের সবার।

“গানে যখন রুচি এসেছে এবার তোমার স্বাস্থ্য ভালো হয়ে যাবে, কৃষ্ণা।” তৃপ্তি বলে।

“না না, কৃষ্ণা স্লিম হবারই সাধনা করছে।” সুপ্রীতি হাসে।

“গান শুনবে, না আলাপ করবে, বলো!” গীতা ট্রানজিস্টার বন্ধ করবার জন্যে হাত বাড়ায়।

“বাঃ, গান শুনতেই যে এলাম!” কৃষ্ণা সুপ্রীতি তৃপ্তির কথায় কান দিয়েছে মনে হল না।

আরো খানিকক্ষণ গান হল। তৃপ্তি অধৈর্য্য। বললে : “গান বেশিক্ষণ শুনতে নেই, মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। সাহিত্যের কথা বলো। কৃষ্ণা, ইংরেজি-সাহিত্যে কী পড়ছ?”

“এতো কিছু পড়তে হয় যে সব গুলিয়ে যায়।”

“এলিঅটকে কী মনে করো তুমি?”

"নিজের সময়ের ব্যর্থতা আর বিষাদ নিয়ে যেন তিনি বিপন্ন। শুনতে ভাল : In this last of meeting places/We grope together/And avoid speech/Gathered on the beach of the humid river."

সুপ্রীতি তৃপ্তিকে বলে : "তুমিত বাংলা-পণ্ডিত। বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে যাহা জানো বলো!"

মাষ্টারি প্রশ্নের ভঙ্গীতে লতিকা জলতরঙ্গের শব্দে হেসে ওঠে।

তৃপ্তি বলে : আমি জীবনানন্দ পড়ি। বাংলা-সাহিত্যের শেষ কবি।"

"কেন ?" জিজ্ঞেস করে কৃষ্ণা।

"সুরঞ্জনা, যেওনাক যুবকের সাথে"—একটা প্রোফেটিক লাইন, লিখতে পেরেছে আর কেউ ?"

"তোমার মতো পুরুষ-বিদ্বেষীর কাছে প্রোফেটিক।" সুপ্রীতি বলে।

"সব মেয়েরই পুরুষ-বিদ্বেষ থাকা উচিত—মাঝে আমেরিকান মেয়েদের যেমন হয়েছিল।"

গীতা হাই তুলে বললে : "যাক্ সুপ্রীতি—পণ্ডিত ত আসলে তুমি! সংস্কৃতসাহিত্য পড়া। তুমি কিছু শ্লোক শোনাও।"

"সংস্কৃত শ্লোকে রম্যাণি বীক্ষ্য কথাটা পেয়েই ত সুপ্রীতিদি রম্য-রচনা পড়তে সুরু করেছেন—না সুপ্রীতিদি ?" লতিকা বলে।

"এবং সংস্কৃত-সাহিত্যে প্রেমের ছড়াছড়িতে এতো রম্যতা দেখেছে যে কথা বলতে গেলেই প্রেমে-পড়ার কথা এসে উপস্থিত হয়।"

"Let us avoid speech" বলে কৃষ্ণা উঠে গেল।

"কিন্তু সুষমাদি ত ঘরে আছেন।" সুপ্রীতি বলে।

"সার্ফ-টিনোপল আর ময়লা শাড়ি-ব্লাউজ নিয়ে তিনি ব্যস্ত।"

"সুষমাদি আমার বৌদির মতো—" বাড়ির গল্প শোনাতে সবসময়ই ব্যস্ত লতিকা : "উনুন খালি পেলেই বৌদি কাপড়-জামা ওয়াড়-চাদর একটা-কিছু সেদ্ধ বসিয়ে দেন।"

"দেখো ডাল-ভাতের বদলে কোন্ দিন না কাপড়-জামা সেদ্ধ খাওয়াতে সুরু করেন।" সুপ্রীতি বলে।

হাসির কোরাস ওঠে ঘরে।

হাসির যদি কোনো রঙ থাকে বা হাল্কা মনের, সেই রঙ মেখে আসে এদের ছুটির দিনগুলো। টীচার বলে যে এরা একটা বিষণ্ণ জগতের মানুষ, যেমন এদের টীচারদের আমলেও ছিল, তা এখন মোটেও নয়।

গীতা বলে: "সুপ্রীতি গেলে আমাদের হাসিই চলে যাবে।"

"তুমি ত হেড্‌মিস্ট্রেসের চাইতেও গম্ভীর, তোমার ক্ষতি কী?" তৃপ্তি লতিকাকে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

স্নানের সময় হয়েছে। শীতের প্রথম। তাই স্নান করতে যেতেও আলস্য, হয়ত বা একটু অনিচ্ছাও। তবু তৈরী হতে হয়। বারোটা বাজে-বাজে।

খেয়ে-দেয়ে ত যে যার ঘরে পাতলা চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুম!

একা হতে পেরে ভাবছিল সুপ্রীতি, আর একমাস পরই ত বাসা-বদল। শমীন-ভাস্বতী-পিকলুর আবহাওয়ায় কেমন লাগবে তার কে জানে? অন্তত এমন ত নয়! ঠিক এমন একটা দিন কি আর আসবে?

॥ চার ॥

নীল খামে চিঠি এলো আরো কয়েকটা। শেষ চিঠি পেয়ে সুপ্রীতি হাওড়া ষ্টেশনে দিল্লী এক্সপ্রেসের অপেক্ষায় গিয়ে দাঁড়াল। পাঁচ বছর পর দেখবে ভাস্বতীকে। যাবার দিন সে বলেছিল: "চলে যাচ্ছি, কিন্তু এতো চিঠি লিখব যে তোমার মনেই হবে না দূরে আছি।" ভাস্বতী তার কথা রেখেছে। কিন্তু তা বলে ত সুপ্রীতি রোজ তাকে কাছে পায়নি। যেদিন চিঠি এসেছে সেদিন মাত্র মনে হ'ত যেন ভাস্বতী সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে।

পাঁচ বছরে সুপ্রীতির কোনো পরিবর্তন হয়নি কিন্তু ভাস্বতীর হয়েছে। সবার আগে কামরা থেকে নেমে ভাস্বতী সুপ্রীতির হাত নিজের হাতে নিয়ে হেসে উঠল: "ভাবছিলাম তুমি আসবে।"

"ঈস্, ভীষন রোগা হয়ে গেছ যে তুমি!"

"দিল্লীর শুকনো হাওয়ায়। এখন হিউমিডিটিতে এসেছি মোটা হয়ে যাব।"

দুই কুলীর মাথায় মাল দিয়ে পিকলুকে কোলে নিয়ে শমীন এসে পাশে দাঁড়াল। হেসে মাথা কাৎ করে বললে: "ভালো আছেন?"

"ভালো দেখছেন না?"

একমাত্র বিয়ের সময় শমীন দেখেছিল সুপ্রীতিকে। চিঠিতে যোগাযোগ না হলেও হয়ত সে মনে রাখত মেয়েটিকে, তার কথা বলার ধরনে।

"আমাদের ওখানে যাচ্ছ ত তুমি?" সুপ্রীতিকে জিজ্ঞেস করে ভাস্বতী।

"ডিসেম্বরের ক'টা দিন চলে যাক্—টীচারির বড়ো ঝামেলা খাতা দেখা চুকুক—নতুন বছরে নতুন বাসা নেওয়া যাবে।"

"চলুন ত এখন—" প্ল্যাটফর্মে হাঁটতে সুরু করলে শমীন।

বয়েস পঁয়ত্রিশ হবে শমীনের। দেখতে একটু মোটাসোটা। সুখী পারিবারিক মানুষের চেহারা। চাকরির বিষয় ইতিহাসের মরা জিনিষ হলেও সে একটা জ্যান্ত মানুষ।

ট্যাক্সি ধরবার আগে সুপ্রীতির পাশে থেমে শমীন আরেকটা কথা বললেঃ "আপনার বন্ধুকে যা দেখছেন, এখানে না এলে ও নিশ্চয় মামি হয়ে যেতো, কী বলেন?"

"ইতিহাসের লোকের কাছে মামির দামই ত সবচাইতে বেশি।" সুপ্রীতি বলে।

ত্ব'জনার কথায়ই ভাস্বতী হাসে।

একটা প্লিমাথ ট্যাক্সির পেছনের সীটেই জায়গা হয়ে গেল চার জনের। একটুও ক্লান্ত দেখাচ্ছিল না শমীনকে। হাওড়া থেকে ভবানীপুর—এই পথটুকু ভাস্বতী আর সুপ্রীতি প্রায় কথাই বললে না, পাশাপাশি ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে রইল। পিকলুও আশ্চর্যভাবে চুপ। কথা বলছিল শমীন। 'ইতিহাসের লোকটোক আমি কিছুই নই— আমি খাঁটি ভারতীয়। মামি-পূজক মিশরীদের ছিল মৃত্যুই জীবন। আমাদের আনন্দই জীবন। ভাসকে আমি বলি এ-কথা। হাসিখুশী থাকতে পারাটা একটা মহৎ কাজ। দিল্লী আমি ছাড়তে চাইনি। আনন্দের হাট ত এখন দিল্লীতেই, কলকাতা ত মরা শহর। ভাসের স্বাস্থ্যের জন্যেই আমি রাজি হলাম আসতে।'

শমীনের কথায় হাসছিল ভাস্বতী। হয়ত শমীনের সব কথায়ই হাসতে হয় ভাস্বতীকে, ভাবলে সুপ্রীতি। স্বামীকে খুশী করা। ব্বাবা! মন খারাপ থাকলেও হাসতে হবে। কথাগুলো ভালো না লাগলেও!

সুপ্রীতি শমীনের কথায় হাঁ-না কিছুই বললে না। চৌরঙ্গী পর্যন্ত একা শমীনই কথা বলে গেল। সুপ্রীতি মাথা নীচু করে ভাস্বতীর ওপাশে পিকলুকে খুঁজলেঃ "তুমি যে আমার সঙ্গে কথাই বলছ না, পিকলু?"

অপরিচিতের কাছে বাচ্চারা যেম্নি কুঁকড়ে যায় তা-ই গেল পিকলু।

ভাস্বতী তাকে সোজা করে বসিয়ে বল্লেঃ "প্রীতি-মাসীর সঙ্গে গল্প করো—দেখছ না কেমন সুন্দর দেখতে, তাই নাম তার প্রীতি!"

"ছাই সুন্দর! হাওড়ার পুল দেখেছ ত পিকলু, তেমন সুন্দর আর কিছু হয় নাকি?" সুপ্রীতি বললে।

"রেল-গাড়ি সুন্দর।" পিকলু তাকাল না, জামার বোতাম খুঁটতে লাগল।

"হাঁ, রেলগাড়ি সুন্দর, জাহাজ সুন্দর, মোটরগাড়ি সুন্দর, এরোপ্লেন সুন্দর, রকেট সুন্দর—এখন এসবই আমাদের সুন্দর, না পিকলু?" পিকলুর সঙ্গে জমে গেল সুপ্রীতি।

"জাহাজ কী?" সুপ্রীতির মুখে তাকাল পিকলু।

"জাহাজ দ্যাখোনি? দেখবে কী করে? ছিলে ত মরুভূমিতে, দেখেছ উট।"

"আমাকে জাহাজ দেখাবে?"

"নিশ্চয়।"

খানিকক্ষণ চুপ থেকে এখন ভাস্বতীকে বললে শমীনঃ "পিশেমশাই চিঠি পেয়েছেন ত?"

"নিশ্চয় পেয়েছেন। আয়েসী মানুষ, তাঁকে ত আর ষ্টেশনে আশা করা যায় না।"

ভাস্বতীর পিশেমশাই ললিত চৌধুরী রিটায়ার্ড জজ। এখন 'প্রাচীন ভারতে বিচার পদ্ধতি' নিয়ে সব সেকেলে কাগজে প্রবন্ধ লেখেন। রায় লেখার বাতিক প্রবন্ধে এসেছে। বাড়ি করেছেন। কিন্তু একটি-মাত্র ছেলে, সে-ও বাড়িতে থাকার সুযোগ পেলে না। সিভিল-সার্জেন মফঃস্বলেই ঘুরছে। এখন চুঁচুড়ায়। স্ত্রী—নলিনী; ভাস্বতীর পিশিমা, ব্লাড-প্রেশারের রোগী। তেতলা থেকে নামেন না। তাঁর ভাই—ভাস্বতীর বাবা, ব্লাড-প্রেশারেই মারা গেছেন। সেই থেকে নলিনীদেবীর মৃত্যুভয়। মেয়ে নেই তাঁদের। ভাস্বতীকেই মেয়ের মতো ভালোবাসেন। তাঁদের শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীটের বাড়িতেই

ভাস্বতীর বিয়ে হয়েছিল—যে-বাড়ির দোতলা নামমাত্র ভাড়ায় শমীন আর ভাস্বতী পাচ্ছে এখন।

"কে বল্‌বে, গিয়ে দেখব হয়ত পিশিমার শরীর খারাপ—" শমীন বলেঃ "সে অস্বস্তিকর আবহাওয়া আমার মোটেও ভালো লাগবে না।"

"আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে থাকলে এমন কিছু ঝামেলা পোয়াতেই হয়।"

"পিশেমশাই যে তাঁর ইতিহাস-চর্চা শোনাতে চাইবেন আমাকে, সে-ও এক ভয়।"

"তুমি শোনাও না?" ভাস্বতীর শিফনের শাড়িটার মতোই হাসিতে মসৃণ হয়ে ওঠে তার মুখ।

ঠোঁটে হাসি টিপে বলে সুপ্রীতিঃ "ভূতের পেছনে ভূত লেলিয়ে দেবেন!"

উঁচু পর্দায় হাসতে থাকে শমীন।

শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীটের মোড়ে ঢুকল ট্যাক্সি। কুয়াশার মিহিন চাদরে ঢাকা আকাশ। তবু আজকের এ ক'টা মুহূর্ত গোলাপী মনে হল সুপ্রীতির। ভাস্বতীকে দেখতে পারাই ত একটা সৌভাগ্য। তাছাড়া শমীন-পিকলুকেও ভালো লাগল তার।

"গৃহ-প্রবেশে আপনি থাকবেন ত?" শমীন তাকাল সুপ্রীতির মুখে।

"না। খাতা-দেখার ভূত ঘাড়ে চেপে আছে। দোরগোড়া থেকেই আমি পালাব!"

বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল ট্যাক্সি। পিশেমশাই ওদের অপেক্ষায়ই দাঁড়িয়েছিলেন। অভ্যর্থনার হাসি মুখে। ভাস্বতী তাড়াতাড়ি নেমে এসে পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে তাঁকে।

"রোগা দেখাচ্ছে তোমাকে? গাড়িতে কষ্ট হয়েছে?" বললেন তিনি। চাকরকে ডাকলেন, মোট-ঘাট নামাবার জন্যে।

সুপ্রীতিও নেমে এসে পিশেমশাইকে প্রণাম করল। ভাস্বতীকে বললেঃ "আমি চলি, ভাস্বতী।"

ললিতবাবু একটু অপ্রস্তুত হয়ে বল্‌লেন: "তোমাকে ত চিনলাম না।"

"আমার বন্ধু।" ভাস্বতী সুপ্রীতির কাঁধে ঝোলানো-ব্যাগের ষ্ট্র্যাপের উপর হাত রেখে বললে।

"আমি চলি।" পারিবারিক মিলনের দৃশ্য থেকে বিদায় নিলে সুপ্রীতি।

শমীন ট্যাক্সি থেকে নামতে নামতে বললে: "এই ট্যাক্সিতেই ত যেতে পারতেন।"

"না, থাক্‌। এটুকু ত পথ। ট্র্যামেই যাব।"

জগুবাবুর বাজারের মোড়ে আসতে ট্র্যামে বসে সুপ্রীতি ভাস্বতীকেই ভাবছিল। বিবাহিত মেয়েদের গহনার উপর যে অসামান্য রোখ তা ওর নেই। তাতে চোখ তৃপ্তি পায় খানিকটা। কিন্তু এখনকার বিবাহিত তরুণ-তরুণীর, মনে যা-ই থাক, ভালোবাসাটা যেমন প্রকাশ্য, শমীন ও ভাস্বতীরও তা-ই। শমীন খুশী হবে বলেই এতো হাসি-খুশী ও এখন। বাবা-মা যার নেই সে কি এতো হাসিখুশী থাকতে পারে? লতিকার ত বয়েস কতো কম, লতিকাই ত নয়। বাবা-মা নিয়ে কেউ গল্প সুরু করলে লতিকা ত কেঁদেই ফেলে। হতে পারে এ-দুঃখ মুছে যায় বিয়ে করলে। তাই এমন বিয়ে-বিয়ে করে লতিকা।

ভাস্বতীর সঙ্গ পাবার দুর্লভ আনন্দেই দেবেন ঘোষ রোডের পথটুকু হেঁটে কখন 'সানি কটে' চলে এলো সুপ্রীতি তা টেরই পেলে না।

গীতা খাতা-দেখা থেকে মুখ তুলে বললে: "তোমার দিল্লীর লাড্ডু এসেছে?"

"হ্যাঁ। খেয়ে পস্তাই নি মোটেও।" সুপ্রীতি খানিকটা হাসি ছিটিয়ে দিলে।

॥ পাঁচ ॥

ডিসেম্বরের ক'টা দিন কাজের ভীড়ে হু-হু করে চলে গেল।

'সানি কট' ছেড়ে যেতে হবে। আবার একটা পরিবর্তন। সুপ্রীতি ভাবছিল, তার জীবনটা কেমন ধারায় চলেছে। ছন্নছাড়া। ভবিষ্যৎ কখনো আঁচ করতে পারল না সে। যতোদিন পড়ছিল, ভেবেছে এম্নি বুঝি চলবে। চলল না। সংস্কৃত অনার্স পড়া শেষ হল। আরো দু'বছর বাড়ানো যেতো পড়া। কিন্তু বাবা-মার অনিচ্ছা। বিয়ের জন্যে উঠে-পড়ে লাগলেন তাঁরা। বিয়ের বয়েস, স্বাস্থ্য সব না কি নষ্ট হতে চলেছে। বরপক্ষের কারো সামনে দাঁড়াতে হলে তার কান্না পেত। বিয়ের জন্যে তৈরী হয়নি সে মোটেও। তাতে তার পড়াও হল না, বিয়েও হল না। কী সে করতে পারে তখন? চাকরি। কলকাতায় এ চাকরিটা হয়ে গেল। কিন্তু কৃষ্ণনগরে বাবা-মাকে রেখে কলকাতায় আসতে হবে—ভাবতেই কেমন কান্না পাচ্ছিল তার। অভ্যস্ত জীবন ছেড়ে আসার ব্যথা।

কাল সে চলে যাবে ভাস্বতীর বাড়িতে, আজও তাই 'সানি কটে'র অভ্যস্ত জীবন ছেড়ে যাবার ব্যথা গম্ভীর করে তুলেছিল সুপ্রীতিকে। এসব দিন যেন অন্ধকার মুখে মেখে আসে। অবশ্যি ভাস্বতী তার সব চাইতে বড়ো বন্ধু—তার সঙ্গে থাকা সে মনে প্রাণে চায় কিন্তু গীতা, তৃপ্তি, লতিকা, কৃষ্ণা—এরাও কি কম? কতো দিনের উষ্ণ স্মৃতি এদের সঙ্গে জড়ানো! এমন একটা বন্ধন যার পাক খুলতে সময় লাগে।

আর একটা ভবিষ্যতে যাচ্ছে সুপ্রীতি যা এখান থেকে এখন থেকে অন্য রকম। হয়ত তখন খারাপ লাগবে না কিন্তু এখন ত লাগছে!

কোনো সময়ই যখন খারাপ লাগত না সেই ছোট-বেলার দিনগুলি মনে পড়ে সুপ্রীতির। এতো রঙ ছিল তখন পৃথিবীতে। নাকি

চোখে ? কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে রাসের মেলায় কতো লোক আর কতো জিনিষ জড়ো হত ! পুতুলগুলো কী সুন্দর ! যেম্নি রঙ, তেম্নি গড়ন। এ মেলার জন্যে মন পড়ে থাকত তার সারাটা বছর। এখন ত কলকাতার ট্র্যামে-বাসে, রাস্তায়-হাটে কতো লোক—সাজানো সব দোকান। কিন্তু একটুও ত ভালো লাগে না তার। ভালো লাগে লোকের মধ্যে একা থাকতে। স্কুলে, 'সানি কটে' তার মন সবসময়ই একা। ভাস্বতীর বাড়িতেও মন তার একাই থাকবে।

'সানি কটে'র টীচারদের সঙ্গেই জীবনটা কেটে যাবে ভেবেছিল সুপ্রীতি। তা হল না। নতুন পরিবেশে যাচ্ছে সে এখন। ভাস্বতীর সঙ্গে থাকতে গেলে জীবন কোন্ ধারায় যায় কে জানে ? চন্দন গাছের সঙ্গে থাকলে যে-কোন গাছ চন্দন হয়ে যায়। বিবাহিত মেয়ের সঙ্গে থাকলে তারও একদিন বিয়েতে মন যেতে পারে। বিয়ে ! তার দিদির একপাল ছেলে-পিলে। কী ভীষণ ! দিদিরও বিবাহিত জীবনের উপর বিদ্বেষ এসে গেছে।

জীবনের মানে কী ? ইন্দ্রিয়-সুখ ? অতীন্দ্রিয় সুখ ? দু'টোর একটা নিয়েই পড়ে আছে মানুষ। কিন্তু তা ছাড়াও যেন আরো কিছু মানে আছে জীবনের—মনে হয় সুপ্রীতির। সংস্কৃত কাব্যে একটা ভালো পংক্তি পেলে তার যে সুখ হত তা কি জীবনের অন্তর্গত নয় ? কিন্তু তা ইন্দ্রিয়সুখও নয়, অতীন্দ্রিয় সুখও নয়। হৃদয় বলে যে একটা অদ্ভুত জিনিষ আছে তার সুখ।

ভাস্বতীর বাড়ি না গিয়ে চাকরি-বাকরি ছেড়ে কৃষ্ণনগর বাবা-মার কাছে চলে গেলেই কি বেশি সুখী হবে সুপ্রীতি ! যায় ত। ছুটিছাটায় সেখানেই ত যায়। আর বাবা-মা বিয়ের তাড়া দিতে সুরু করেন ! বাবা-মার ইচ্ছা পূরণ করলে তাঁরা সুখী হবেন কিন্তু তার এই ত্যাগ—ত্যাগ ছাড়া আর কী—এই ত্যাগ কি তাকে সুখী করবে ? না। ভাস্বতী কি সত্যি সুখী। টীচার শুভাদি, মায়াদি—এঁরা বিবাহিতা—ফ্যামিলি প্ল্যানিং মানেন, ছেলেপিলের বেশি ঝঞ্ঝাট নেই কিন্তু সুপ্রীতির মতো হাসতে পারেন কি তাঁরা ? না। ভাস্বতী হাসিখুশী। কিন্তু তা ত দায়ে

পড়ে। স্বামীকে খুশী করবার জন্যে। অন্য একটি মানুষকে খুশী রাখতে হবে, কী দায় পড়েছে আমার? কিন্তু বিয়ে তা-ই। ডিগ্রী নিয়ে বেরুচ্ছে বলেই কি স্বাতন্ত্র্য এসেছে মেয়েদের? বিয়ে হলে লেখা পড়া-না-জানা মেয়ে যেম্নি এম-এ পাশ মেয়েও তেম্নি। একই রকম স্বামীর মনস্তুষ্টি, একই রকম শাড়ি-গয়নার উপর ঝোক।

বেশি ভাববার অভ্যাস নেই সুপ্রীতির। কিন্তু আজ ভাবনা আসছিল। জীবনের কোনো স্পষ্ট ছবি তার সামনে নেই। ভাবনা করেও বা কোথায় পৌঁছুবে সে? কোনো নিয়তি সে তৈরী করতে পারছে না। একটি সিদ্ধান্তই মানে একটি নিয়তি তৈরী করা। কাল যে সে ভাস্বতীর বাড়ি যাচ্ছে তা-ও যেন স্থির সিদ্ধান্ত নয়। এখানে, এই 'সানি কটে' থাকবার চাইতে যেন বড়ো সত্য আর কিছু নেই। গীতার সঙ্গে এই ঘরে থাকা যে কাল থেকে মিথ্যা হয়ে যাবে তা ভাবতে পারছিল না সুপ্রীতি।

সুপ্রীতি চলে যাবে তাই সুষমাদি রাত্রিতে ভালো খাবার ব্যবস্থা করেছেন। ডাল-ভাত-মাছের ঝোল যা হয় তার উপর ছানার ডালনা আর ভেটকী-ফ্রাই। ফ্রাই ঠাকুর করতে জানে না, বিস্কুটের গুঁড়ো বেশি দিয়ে ফেলে কিম্বা কাঁটা থেকে যায় মাছে, তাই নিজ হাতে ফ্রাই করছেন সুষমাদি। হেসে সুপ্রীতিকে বললেন: "আজ একটু স্পেশ্যাল ডিশ্। লাষ্ট সাপার কি না!"

"তারপর কি আমার যীশুর মতো ভাগ্যি হবে না কি সুষমাদি—" সুপ্রীতি আব্দারের নাকী সুরে বললে।

কৃষ্ণা বললে: "পরিবারে ঢুকছ—এ ত মৃত্যুরই সামিল!"

সন্ধ্যায় ভরে উঠেছিল সুপ্রীতির ঘর। দুপুর-বিকেল কোথায় কাটিয়ে গীতা ফিরে এসেছে। ফোর্থ-পেপার রোমান্টিক পিরিয়ডের পড়া ছেড়ে কৃষ্ণাও হাজির। যা একটা বিস্ময়কর ব্যতিক্রম। সুষমাদি কথাটা বলেই চলে গেলেন রান্নাঘরে। তৃপ্তি আর লতিকা কী এক কথা নিয়ে ন করছে ও ঘরে। একটু পরেই আসবে হয়ত। মন থেকে সারা নের অন্ধকারের বোঝা নেমে গেছে সুপ্রীতির। সবার মধ্যে নিজেকে

নিয়ে একা থাকা বেশ, কিন্তু নির্জনতা ভয়ানক। সারাটা দিন নির্জন থেকে ভাবনার দৌরাত্ম্য ভুগেছে সে। এখন সে হাল্কা। কৃষ্ণা যে একটা অশুভ ইঙ্গিত করল তাতেও থমকে গেল না সুপ্রীতি। বললে: "মৃত্যুকে যেমন এড়াতে পারিনে, পরিবারকেও না।"

"পরিবার তোমার বিষ হয়ে উঠল কেন, কৃষ্ণা?" গীতা জিজ্ঞেস করে।

"ওর ত আর পরিবার নেই, তাই। মা থাকেন দাদার পরিবারে মুর্শিদাবাদে।" সুপ্রীতি বলে।

"আছে। ওই যে মেয়েটি এসে মাসে দশ টাকা নিয়ে যায়। ওকে নিয়েই ওর পরিবার। পরিবার থাকলেই খরচ, তাই পরিবার ওর কাছে বিষ।" বিশ্লেষণ করে গীতা।

ক্লাশ এটের ক্লাশ-টীচার কৃষ্ণা। এক মাইনের তারিখে একটি মেয়ে কেঁদে এসে বলেছিল: আর সে পড়তে পারবে না, তার বাবা বলেছেন আর মাইনে দিতে পারবেন না। মেয়েটি পড়াশুনোয় ভালো। কৃষ্ণা তাকে মাসে দশ টাকা দেবে বলেছিল। দিয়েও আসছে।

"নিজের পরিবার তৈরী করতে গীতার সখ হয়েছে, বুঝলে ত সুপ্রীতি?" কৃষ্ণা বলে।

লতিকা আসে। একটু সেজেছে। পায়ে নেলপলিশ, কপালে কুঙ্কুমের একটা সোজা রেখা আর গাঢ় লাল বুঁটিদার ভয়েলের শাড়ি।

"আজ আমাদের প্রীতিভোজ, না সুপ্রীতিদি?" বললে সে।

"কী জানি! কিন্তু তুমি ত দেখছি দারুন সেজে এসেছ!" বলল সুপ্রীতি।

"গোপালভাঁড়ের দেশে মানুষ হয়েছে কি না সুপ্রীতি, তাই রঙ্গরস ছাড়া ওর কথা নেই—রাগ করো না তুমি লতিকা।" গীতা লতিকাকে হাত ধরে বসিয়ে বললে।

"প্রীতিভোজ নয়, সুপ্রীতিভোজ আজ—জানলে?" বললে কৃষ্ণা।

"সত্যি আজ একটু সাজতে ইচ্ছে হল, কৃষ্ণাদি—" হাত দুলিয়ে বললে লতিকা, যা তার অভ্যাস: "সাজবার ত আমাদের সুযোগ হয় না।"

"তা বটে !" সুপ্রীতি : "বিয়ের নিমন্ত্রণ আমরা পাচ্ছি কোথায় ?"

"পেলেও যেতে পারব না। তেমন শাড়িই নেই।" কৃষ্ণা।

"তৃপ্তি চেঁচাচ্ছিল কেন রে লতিকা ?" গীতা জিজ্ঞেস করলে।

"সোশ্যাল ষ্টাডিতে সিন্ধুসভ্যতার কথা কেন, ইতিহাস বই-এ তা নয় কেন তা নিয়ে তর্ক করছিল আমার সঙ্গে।"

"টেনে সোশ্যাল ষ্টাডির ক'টা ক্লাশ নিতে হয়েছিল ওকে। হয়ত নাকাল হয়েছে !" সুপ্রীতি অনুমান করে।

"গীতাদি, তোমার ট্রানজিস্টার খোলো না !" লতিকা যেন গান শুনতেই তৈরী হয়ে এসেছে।

গানে আপত্তি নেই কারো। গান চলল। সুষমাদি উঁকি দিয়ে বললেন : "আদা-পেঁয়াজের রসে ভিজিয়ে এলাম মাছ। তোমাদের গানের আসরে একটু বসে যাই।"

"আমার জন্যে আপনি এতো পরিশ্রম করছেন, সুষমাদি !" সুপ্রীতি বললে।

"পরিশ্রম !" হাসলেন সুষমাদি : "রান্নার কাজে আবার পরিশ্রম হয় নাকি ? মনোযোগ দরকার, চরকা-কাটায় যেমন মনোযোগ চাই তেম্নি।"

কৃষ্ণা ঘাড় নাড়লে কিন্তু গীতার আর লতিকার তখন গানে অখণ্ড মনোযোগ।

॥ ছয় ॥

হৈ-চৈ করে খেয়ে রাত এগারোটার মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছিল সবাই। সুপ্রীতির ঘুম আসছিল না। বারান্দায় চেয়ার টেনে র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে বসেছিল সে। ভাস্বতীকে নয়, ভাবছে সে তৃপ্তিকে। একটু আলগা আলগা ভাব যেন তার। সুষমাদি পরিবেষণ করছিলেন, সাধাসাধি করেও তাকে বেশি কিছু খাওয়াতে পারেন নি। কিন্তু ঘুম যে তার আসছে না সে কি তৃপ্তির কথা ভেবে? না। কাল যে চলে যেতে হবে, কাল থেকে যে কেমন দিন সুরু হবে তা নিয়েই কথা কাটাকাটি করছিল মন।

তৃপ্তির ঘর থেকে হঠাৎ একটা ছায়া বেরিয়ে এলো। তৃপ্তি। সে-ও ঘুমোয়নি। সুপ্রীতির পাশে এসে দাঁড়াল তৃপ্তি।

"ঘুম ভেঙে গেল?" বললে সুপ্রীতি।

"ঘুমুইনি। সারাদিন একটা কথা ভাবছিলাম—এখনো ভাবছি।"

"না না গো না, করো না ভাবনা।" সুপ্রীতি হাসলে।

"তুমি চলে যাচ্ছ, তোমার কাছে খানিকটা কনফেশন করব।" তৃপ্তিকে গম্ভীর শোনাল।

"খ্রীষ্টানরা ত নিজেরা পৃথিবী থেকে চলে যাবার সময় কনফেশন করে! আমি যাব, তুমি কেন কনফেশন করছ?"

"ভালো লাগছে না। কথাগুলো মনে শুধু ঘুরপাক খাচ্ছে।"

"আমাকে শোনালে হাল্কা হবে? ঘুমুতে পারবে?"

"কী জানি! তবে শোনো। তোমারও উপকার হতে পারে।"

"বেশ বলো। চেয়ার নিয়ে এসো। চেয়ারে আরাম করে বসে বলো।"

ঘর থেকে চেয়ার নিয়ে এলো তৃপ্তি। সুপ্রীতির পাশাপাশি বসে বলতে সুরু করলে তার ইতিহাস:

"আমি আমাদের বীডন স্ট্রীটের বাড়িতে প্রায় যাই-ই নে। বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি কেন 'সানি কটে' তা জানো? আমরা পাঁচ বোন, ছয় ভাই। বাড়ি নয় ত একটা হাট। এতো ভাই-বোন যে মার উপর আমার রীতিমতো রাগ হত।"

সুপ্রীতি বললে: "ফ্যামিলি-প্ল্যানিং ত তাঁরা বুঝতেন না! এটা ত হালআমলের ব্যাপার!"

"কিন্তু তাতেও হয়ত আমি বাড়ি ছেড়ে আসতাম না। আমাদের এক দূর সম্পর্কের দাদা আসতেন আমাদের বাড়ি। ফটো তোলার সখ ছিল তাঁর। ভাইবোনদের মধ্যে আমিই তাঁর নজরে পড়ে যাই। বলতেন, আমার নাকি ক্যামেরা-ফেস্। বারো বছর পর্যন্ত কোনো মেয়ে হয়ত পুরুষের নজরে পড়ে না। আমার বয়েস তখন তেরো। নজরে পড়ার বয়েস। থার্ডক্লাশে পড়তাম। সেই দাদা তখন ফটো তুলতে শুরু করেন আমার। তাছাড়াও চৌরঙ্গীতে-ময়দানে বেড়াতে নিয়ে আসতেন মাঝে-মাঝে। রেষ্টুরেন্টে খাওয়াতেন। সিনেমায়ও গেছি তাঁর সঙ্গে অনেকদিন। ঘরে আলো নিভে গেলেই আমার পিঠে হাত রাখতেন। সে-হাত যে ঘাড় পেরিয়ে বুকে এসে ঠেকত না, তা নয়। আমি চুপ করে থাকতাম। কেন যে থাকতাম পরে ভেবেছি, তখন নয়।"

সুপ্রীতি একটু অন্যমনস্ক হয়ে যেন বললে: "আমাদের দেশের মেয়েরা ত 'লোলিটা' উপন্যাসের নায়িকা নয় যে ছোট বয়সেই কাজে-কথায় অশালীন হয়ে উঠবে!"

নখে খুঁটে কয়েকটা এলাচ-দানা মুখে পুরে তৃপ্তি বললে: "তারপর শোনই না। ফার্ষ্ট-ইয়ারে পড়ি তখন, আমার সেই দাদা একটা ফটো নিচ্ছিলেন! ঘরে আর কেউ ছিল না। আমার মুখটা আলোর দিকে ফিরিয়ে দেবার দরকার হল! ফিরিয়ে দিতে গিয়ে হঠাৎ ঠোঁটে চুমু খেলেন। আমি হাসছিলাম। ক্যামেরায় তাঁর হাত কাঁপছিল। তারপর আরো লোভী হয়ে পড়েছিলেন তিনি। আমি ভাবলাম ও বাড়িতে থাকলে তাঁর লোভ থেকে বাঁচতে পারব না। তাঁর ব্যবহারেই আমি ভাবতে শিখেছি, পুরুষদের বিশ্বাস করতে নেই।"

সুপ্রীতি গম্ভীর হয়ে বল্‌লে ঃ "মেয়েদেরও ওই একটা সাংঘাতিক বয়েস যখন শরীর কারো ছোঁওয়া চায়।"

"শরীরটাই কি সব। ভালোবাসবার মতো আর কিছু নেই?"

হাসতে থাকে সুপ্রীতি ঃ "তুমি না সিনেমায় অভিনয় করতে চাও. সেখানে ত মেয়েদের শরীর দেখানোই কাজ।"

"হুঁ।" চিন্তিত দেখায় তৃপ্তিকে ঃ "শরীরটাকে আমি হয়ত খুব ভালোবাসতাম। দ্যাখোনি, কতো ছবিই না তুলেছি নিজের!"

"তাহলে সে-শরীর যদি কোনো পুরুষ ভালোবাসে তাহলে ত তোমার খুশী হবার কথা। তা-ই না?"

"আমার সেই দাদা ওয়েষ্ট জার্মেনীতে চলে গেছেন, ফটোগ্রাফি শিখতে।"

"তাতে বুঝি তোমার দুঃখ?"

"মোটেও না।" মাথা নাড়ে তৃপ্তি ঃ "সুপ্রীতি, তোমায় ভালো-বেসেছে কেউ কোনোদিন?"

"আমি এতো কথা বলি যে তা শুনেই ওদের ভালোবাসার ভূত ভেগে যায়।"

"বিয়ে না করলে কাউকে ভালোবাসতে হয়?"

"ভালোবাসলে যদি বিয়ে করতে ইচ্ছে যায়?"

"তাহলে ভালোবাসা যাবে!"

"যাক্ না, একটা গিয়েই ত আরেকটা হয়! বিজ্ঞান বলে না দুটো জিনিষ একসময়ে এক জায়গায় থাকতে পারে না!"

তৃপ্তি চুপ করে রইল।

সুপ্রীতি তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললে ঃ "ছেলেবেলাকার কিছু-না-কিছু অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা সবারই থাকে তৃপ্তি, তাকে মনে পুষে রাখতে নেই।"

"তোমার আছে?"

"বলেছি ত। আমার সঙ্গে আলাপ করলেই আমাকে ছেলেরা এড়াতে চায়।"

"যাও। ওসব বাজে কথা বলছ তুমি।"

"তুমিও কি না ঘুমিয়ে কাজের কথা ভাবছ?"

"ভাবছি কেন জানো? ছুটিতে বীডন স্ট্রীটের বাড়িতে গিয়েছিলাম। সেখানে শুনলাম, আমার সেই দাদা শীগগীরই ফিরে আসছেন।"

"তাতেই বুঝি তোমার ইমোশন-রিকালেক্টেড হল?"

"ইমোশন? আমার কোনো ইমোশন নেই ওর সম্পর্কে।"

"যাক্—এখন ঘুমোও গে তৃপ্তি! কনফেশন করে নিশ্চয়ই অনেকটা হাল্কা হয়েছ তুমি।'

একটা আস্ত এলাচ মুখে তৃপ্তি বললে: "হাঁ।"

॥ সাত ॥

পিকলুর জন্যে কটস্-উলের প্যাণ্ট আর বুশশার্ট নিয়ে এসেছিল সুপ্রীতি। শমীন বললেঃ "এতোদিন দূরের মানুষ ছিলেন, এখন ত ঘরের মানুষ, এসব আবার কেন?" ভাস্বতী বললেঃ "সুন্দর হয়েছে, কটস্-উল ছিল না ওর।"

"যা ছিল তা-ই ত এক রাজ্যের!"

"আজকালকার মেয়েদের চেনেন না আপনি। বাচ্চাদের সাজানো আমাদের একটা নেশা!"

পয়লা জানুয়ারি। ছুটির দিন। তার আরাম যেন গভীর করে তুলল সুপ্রীতি এসে। সুপ্রীতির জন্যে ভাস্বতী সব চাইতে ভালো ঘরটা রেখেছে। দক্ষিণে রাস্তা, কাজেই সেদিকটা খোলা—সেদিকে ঘরের বারান্দা। পূবও খানিকটা পাওয়া যায়।

শমীন-ভাস্বতী চাকরকে নিয়ে সুপ্রীতির খাট-টেবিল-চেয়ার আলনা ট্রাঙ্ক-সুটকেস সাজিয়ে দিল। সুপ্রীতিও হাত লাগাতে চাইল। ভাস্বতী বললেঃ "তুমি চুপচাপ বসে ছাখো।"

"ঘরের কাজ করতে বুঝি খুব আরাম পাও তুমি?" সুপ্রীতি বলে।

"বাইরের কাজ যখন ফুরিয়েছে, কাজেই।"

কিন্তু কাজ কি করতে পারে ভাস্বতী। পিকলু ডাকতে সুরু করে, এটা দাও, ওটা দাও। ছুটে ছুটে যেতে হয় ভাস্বতীকে। না গেলে এমন চেঁচিয়ে কথা বলতে সুরু করে যে সাধ্য কি কারো সেখানে তিষ্ঠোয়। ভাস্বতী শোনায় সুপ্রীতিকেঃ "যা মর্জি হবে তা রাখতে হবে। নইলে চীৎকার। চীৎকারে ফল না হলে কাপ-ডিশ ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে ভাঙা।"

"বড়ো হলে বিপ্লবী হবে।" সুপ্রীতি হাসে।

"ও বুঝে নিয়েছে ওর মর্জি রাখবার জন্যে আমরা ব্যস্ত। তাই এমন স্বভাব।"

"হবেই। দিনে তিনবার ওর পোষাক বদল করছ আর ওর হুকুম তামিল করাই হয়েছে তোমার একমাত্র কাজ। পড়াশুনোও কর না বুঝি আজকাল?"

"পড়ায় ওঁর খুব মত নেই।"

"ঘরের কাজে খুব মত বুঝি?"

"তা-ই। বলেন, পড়তে হলে ডোমেষ্টিক সায়ান্সের বই পড়ো।"

"মিউজিঅমে থাকবার মতোই মানুষ দেখছি।"

একটা ছড়া বলতে বলতে পিকলু দৌড়ে আসে। দু'হাতে তাকে পাঁজা করে ধরে সুপ্রীতি বলে: "আমি কে জানো ত?"

"প্রিটি।"

"মোটেও না। আমি বাচ্চাদের পড়াই। ছড়া কাটলে চলবে না, মোটা-মোটা বই পড়তে হবে আমার কাছে।"

"মা, আমার বই দাও—" ভাস্বতীর পেছু নিলে পিকলু।

"এখন কী? সন্ধ্যাবেলা।"

"না-না-না। এক্ষুণি। দাও—দাও—" গলা চড়াতে সুরু করলে পিকলু।

দিদির অনেক বাচ্চা তাছাড়া স্কুলে বাচ্চারা আছে। বাচ্চাদের ভালোবাসে সুপ্রীতি। পিকলুকে নিয়ে তাই সারা সকালটা কেটে গেল।

দুপুরে তিনজনের একসঙ্গে খাবার কথা—শমীন-ভাস্বতী আর সুপ্রীতির। শমীন আর সুপ্রীতি বসে আছে। ভাস্বতী পিকলুকে ঘুম পাড়িয়ে আসবে। একটু দেরি হচ্ছিল। শমীনের সঙ্গে একা থাকার এই মুহূর্তগুলো নিছক গল্পে ভরিয়ে তুললে সুপ্রীতি: "আমি কিন্তু একশ' টাকা দেব। আপনাদের নিতে হবে।"

"না-না।" টাকা পয়সা লেনদেনের কথায় বিব্রত বোধ করলে শমীন: "পিশেমশাই ত খুব কম ভাড়ায় আমাদের ফ্ল্যাটটা দিয়েছেন। 'সানি কটে' আপনার যা খরচ হত, এখানেও তা-ই করবেন।"

"এমন সুন্দর একটা ঘরের ভাড়াই ত আজকাল একশ' টাকা।"

"ঘরটা দেখে যে আপনি সুখী হয়েছেন তাতেই আমরা খুশী।"

"আমাদের পক্ষে এখানে থাকা ত রীতিমতো শৌখীনতা!"

"টীচার বলে কি আপনাদের শৌখীনতা থাকতে নেই?"

"হয়ত নেই। জানেন, আমরা সিল্ক পরে স্কুলে যেতে পারিনে। হেডমিষ্ট্রেস রাগ করেন। মেয়েরা ইউনিফর্ম পরে আসে, আমরা কেন বাবুগিরি করব!"

"সাধে আমি এ-কাজটা অপছন্দ করি!"

ভাস্বতী এলো। বললেঃ "বায়না ধরেছে প্রিটির দেওয়া জামা পরব, নইলে ঘুমুব না!"

"একটি বাচ্চা বলে এতো সব চলছে—" শমীন হাসল।

ভাস্বতীও হেসে বললেঃ "আমার ত কোনো ডিমাণ্ড নেই। ওর ডিমাণ্ড থাকা উচিত।"

"তোমার ডিমাণ্ড নেই মানে? তোমাকে ছাড়া আমার সময় আছে নাকি?"

"মনে হচ্ছে অপিসে বসেও আমার কথাই ভাবো! ঈস্!"

"নিশ্চয়। মনে হয়, বাড়িতে একটা টেলিফোন থাকলে ভালো হত!"

স্ত্রীকে কে না ফাঁকি দেয়—সুপ্রীতি ভাবে। শমীন হয়ত আরো বেশি। নইলে তার সামনে ভাস্বতীকে তার এসব কথা বলার কী মানে থাকতে পারে?

খাওয়া সুরু হল। মাছ-কপি-ছোলার ডাল-টম্যাটো ছাড়াও চিকেন ছিল। অন্য মাংস ভাস্বতীর পছন্দ নয়। নাকে গন্ধ লাগে। সুপ্রীতি বললেঃ "ভাস্বতী কী করে জানি। কিন্তু মেয়েদের কিন্তু বেশি খাওয়া অভ্যাস। দেখে ঘাবড়ে যাবেন না!"

"খেতে পারতাম আমিও—এখন অবশ্যি তেমন নয়—ছেলেবেলায়!" শমীন খাওয়ার গল্প জুড়ে দেয়ঃ "মা এমন চমৎকার রাঁধতেন। সাধারণ একটা মুসুরিডাল, কী তার স্বাদ! তেমন ডাল আর কারো হাতে খাইনি। কী পরিমাণ হলুদ-লঙ্কা-নুন দিতে হবে—কতোটা সেদ্ধ

করতে হবে, ফোড়নে মেথি দেবেন কতোটা—এমন সুন্দর জানা ছিল তাঁর যে একদিনও এদিক-ওদিক হত না। এক ডাল দিয়েই কতো ভাত খেয়েছি।"

ভাস্বতী বললে: "সুপ্রীতি, মাংস আমি নিতাইকে রাঁধতে দিইনি, নিজে রেঁধেছি—শুধু তোমার জন্যে—তোমাকেই বেশিটা খেতে হবে।"

"চিকেনকে আবার মাংস বলে নাকি—ও ত রোগীর পথ্য।" শমীন বলে।

"অতএব আমাকে তুমি তোমার পথ্য কেন খাওয়াতে চাচ্ছ ভাস্বতী?" সুপ্রীতি যোগ দেয়।

"খেলে কিছু তুমি রোগী হয়ে যাবে না।"

"তা জানি। রোগের বীজাণু খেলেও আমার রোগ হয় না।"

"সত্যি—" একটু সপ্রশংস হয়ে শমীন বলে: "টীচারদের মতো খারাপ স্বাস্থ্য আপনার নয়।"

"মন-মেজাজও নয়। চট করে একটা কাজ আমি করে ফেলি, ভেবে-চিন্তে করিনে।"

খাওয়া শেষ হয়। সুপ্রীতিকে একবাটি মাংস খেতে হয়। শমীন আর ভাস্বতী নাম-মাত্র খায়। সুপ্রীতি বলে: "আমি ত নিমন্ত্রণ খেতে আসিনি তবে এ-ব্যবস্থা কেন?" কিন্তু খায় সে। খাওয়ার শেষে শমীনকে বলে: "মেয়েরা যে বেশি খায় তার প্রমাণ দিলাম।"

খাওয়ার পর ভাস্বতীর পিশিমার কাছে যাওয়া অভ্যাস। যেতে হবেই। না গেলে চাকর পাঠিয়ে দেবেন তিনি। রাজশেখর বসুর মহাভারত পড়ে শোনায় তাঁকে ভাস্বতী। আর তাঁর রোজই এক কথা: "তোর বাবা এতো অল্প বয়েসে গেল! আমি ওর পাঁচ বছরের বড়ো।" আজও ভাস্বতী গেল পিশিমার কাছে।

সুপ্রীতি তার ঘরে একা। ছুটির দিনে র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে দুপুরে সে ঘুমোয়। তারই আয়োজন করছিল সে। কিন্তু শমীন এসে আলাপ জুড়ে দিতে পারে সে আশঙ্কাও ছিল।

।। আট ।।

অফ-পিরিয়ডে সুপ্রীতি শুভাদির সঙ্গে আলাপ করছিল টীচার্স রুমে। শুভাদি বিবাহিতা। চল্লিশ হবে বয়েস। মুখরোচক বিষয়ই হল তাঁর বিয়ে। সুপ্রীতি এসব কথায় মোটেও উৎসাহ দেয় না। তাতে কী? তিনি বকেই চলেন। ভয় দেখান। বিয়ে না করলে আখেরে দুর্গতির সীমা নেই। তোমার জন্যে কে ভাববে? একা কেউ থাকতে পারে নাকি? সুপ্রীতি হেসে বলেঃ "শুভাদি, কোনো ঘটক-অফিসে আপনি পার্ট-টাইম কাজ নিন। ওখানেই আপনার প্রতিভা খুলে যাবে।"

"বুঝতে পারছ না, সুপ্রীতি, জীবনের কতো বড়ো একটা অভিজ্ঞতা থেকে তোমরা বঞ্চিত।" শুভাদি মোটেও দমে যান না!

"আপনি য়ুরোপ দেখেন নি। আপনি কি একটা বড়ো অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত নন?"

"সে কি এক কথা হল? এ অভিজ্ঞতা তুমি ইচ্ছে করলেই পেতে পারো।"

"বিয়ে-না-করার অভিজ্ঞতা থেকে যে বঞ্চিত হব তখন?"

"এ অভিজ্ঞতা ত হয়েইছে। মানুষ নতুন কিছু চাইবে না?"

"বিয়ের পরও ত নতুন কিছু চাইতে পারে। যেমন, ধরুন—ডিভোর্স।" সুষমাদি রুটিন রিভাইস করে টীচার্স-রুমে এসে ঢুকলেন। শুভাদির আলাপে ছেদ পড়ল। সুষমা এদিকেই আসছে দেখে তিনি নিজের ডেস্কে চলে গেলেন।

সুপ্রীতির কাছেই এসেছেন সুষমাদি। বললেনঃ "তুমি বোধ হয় খবরটা পাওনি, সুপ্রীতি!"

"কী খবর? না।"

সুপ্রীতি মনে-মনে চমকালো, তৃপ্তির কিছু হয়নি ত! মনে একটা

অতৃপ্তির বোঝা নিয়ে চলেছে সে। হঠাৎ কিছু করে ফেলতে পারেও বা।

সুষমাদি বললেন: "গীতা এনগেজড্। রিপন না সিটি কলেজের এক প্রফেসারের সঙ্গে না কি অনেকদিনেরই ভাব ছিল তার।"

"একসঙ্গে এতোদিন ছিলাম, কিছুই ত বুঝিনি।"

"না বুঝবার কী আছে? স্কুল থেকে চলে যেত কোথায়। ফিরে আসত 'সানি কটে' রাত আটটা-ন'টায়।"

"গীতার মুখেই শুনলেন আপনি ওর বিয়ের খবর?"

"না। কৃষ্ণাকে বলেছে।"

"বর্ধমানে ওর মা-বাবাকে জানিয়েছে?"

"জানাবে কী? সিভিল-ম্যারেজ। কাজ হয়ে গেলে জানাবে। পরিবারকে সব কিছু কি জানায় আজকালকার মেয়ে?"

পরের সংরাগ-বিরাগের সঙ্গে আমরা যতোটুকু পরিচিত, নিজের ওসবের সঙ্গে ততোটুকু নই—সুপ্রীতি ভাবলে—নইলে কাজে ডুবে থাকেন যে সুষমাদি তিনি গীতার মনের খবর এত বলেন কি করে? হেসে আলাপটা সমাপ্ত করতে চাইল সুপ্রীতি: "এই মাত্র শুভাদি বিয়ের গল্প করছিলেন, আর আপনি ঠিক তক্ষুনি নিয়ে এলেন বিয়ের খবর!"

সুষমাদি একটু গম্ভীর হলেন: "তোমাদের নিয়ে 'সানি কটে' সুখে ছিলাম। তুমি চলে গেলে ভাস্বতীর ওখানে, গীতা চলল ঘর-সংসার করতে! থাকব কী করে?"

"থাকবার জায়গা পায় না কি আজকাল মানুষ? রেল-লাইনের ধারে মাচা বেঁধে লোক থাকে! 'সানি কটে' কি ঘর খালি থাকবে?"

"সুলেখা একটা ঘর চায়। রিসার্চ-ওয়ার্ক করছে কিনা! ভাবছি, সুলেখাকে তোমাদের ঘরে আসতে বলব।"

চেয়ার টেনে বসেন সুষমাদি। এবার হয়ত বক্তৃতা সুরু হবে

খরে
র—সুপ্রীতির আশঙ্কা হয়। আশঙ্কা মিথ্যে নয়। সুষমাদি সুরু করেন : "জানো সুপ্রীতি, কুড়ি থেকে ত্রিশের মধ্যে যেসব মেয়ের বয়েস, তারা বিয়ে ছাড়া আর-কিছুই ভাবতে পারে না। অবসর সময়ে পড়ো, তা না, বই ছোঁবে না—টীচারদেরই বেশি বিতৃষ্ণা পড়ার উপর! একটা স্বাধীন দেশে কি তা-ই হওয়া উচিত? কতো দায়িত্ব টীচারদের! তাছাড়া মেয়েদের এখন কতো কী শেখানো হচ্ছে! টীচারদের শুধু বি-এ পাশের বিদ্যেটুকু নিয়ে চলবে কেন? বাঙালী শিক্ষিত মধ্যবিত্তের প্রায় প্রত্যেক ঘরে একজন টীচার পাওয়া যাবে। আর এই ত মেয়েদের উপযুক্ত প্রোফেশন। এটা বুঝবে না মেয়েরা? এখনো সেকেলে মেয়েদের মতো বিয়ের ধ্যান করবে?"

"মেয়েরা অনেক সময় নিজেদের অসহায় মনে করে, বাবা-মা না থাকলে ত আরো বেশি। আর বাবা-মা থাকলেও বা কী? মেয়ে বড়ো হয়ে গেলে কি স্নেহমমতা থাকে তাদের তেমন? কিন্তু স্নেহমমতা সব বয়েসেই চায় মেয়েরা, বিয়ে করার একটা কারণ তা-ই।" সুপ্রীতি বলে।

সুষমাদি নিজেকে অসহায় মনে করেন না। বরং তাঁর পরিবার অসহায়। তাঁর রোজগার ছাড়া ত চলবেই না। বলেন : "মেয়েরা যদি অসহায়ই বোধ করে তবে তাদের শিক্ষা-দীক্ষা-চাকরি কেন?"

বছরের প্রথম দিকটায় সুষমাদিকে ছাড়া হেডমিষ্ট্রেসের এক মুহূর্ত চলে না। তিনি শ্লিপ পাঠালেন। ডাকছেন সুষমাদিকে। উঠে চলে গেলেন তিনি তাঁর স্বাভাবিক হাসিতে বিদায় নিয়ে।

টিফিনের সময় গীতাকে ঘিরেদাঁড়াল সুপ্রীতি, তৃপ্তি আর লতিকা। সুপ্রীতি বললে : "তোমার দুষ্মন্তের নামটি কী শকুন্তলা?"

"প্রিয়ম্বদা-অনুসূয়ারা গিয়ে তা জিজ্ঞেস করো।" তৃপ্তি হাসল। "বাবা, এখনি নাম বলতে নেই?"

"নিরঞ্জন বোস।"

তৃপ্তি থরথরে হয়ে ওঠে : "বিয়ের পর শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা করবে, না পড়ানোর লাইনেই থাকবে?"

"ডি-রেল্‌ড্‌ হবে না গীতা, নিরঞ্জনবাবু যখন প্রফেসর।" সুপ্রী[তি]
উত্তর দেয়।

"তুমি ত বেশ করে-কম্মে নিলে গীতাদি। আমার দাদারা কতো দেখছেন, কিছুই হচ্ছে না।" লতিকা হাসতে সুরু করে।

গীতা গম্ভীর হয়ে থাকে। ওই জটলা সহজেই ভেঙে যায়। তাছাড়া অন্য টীচাররাও বার বার তাদের দিকে তাকাচ্ছে। শুভাদি এসে জুটলে আর উপায় নেই—ভাবলে সুপ্রীতি। নিজের ডেস্কে চলে এলো সে।

জানুয়ারীর বেলা। একটু পরেই কমলালেবুর মতো হয়ে যাবে রোদের রঙ। মন বাড়ি-মুখো হয়ে উঠবে। বাড়ি গিয়ে ভাস্বতীর সঙ্গে গল্প। যতোক্ষণ না শমীনবাবু আসেন। তিনি এলে, তার সঙ্গে ভাস্বতী বেড়াতে বেরোয়। পিকলু আগে তাদের সঙ্গে যেত। এখন তার কাছে থাকতেই ভালোবাসে। ওকে নিয়ে বসলেই ও বলবে: "জহরলালের মতো মীটিং করো।" সুপ্রীতি বলে: "উনি ত ওঁর জন্মদিনে বাচ্চাদের নিয়ে মীটিং করেন, আমি রোজ স্কুলে তোমার চাইতে একটু বড়ো বাচ্চাদের নিয়ে মীটিং করি।" পিকলু বলে: "তাহলে এখনও করো।" সুপ্রীতি বলে: "বোকা, একটি বাচ্চাতে কি মীটিং হয়?" পিকলুর সঙ্গে বেশ কাটে তার সময়টা। প্রথম-প্রথম ভাস্বতী বলেছিল: "তুমিও চলো আমাদের সঙ্গে বেড়াতে।" সুপ্রীতি রাজি হয়নি: "না না, এখন শুয়ে এপাশ-ওপাশ করতেই ভালো লাগে।" আসলে, সুপ্রীতি স্বামী-স্ত্রীর নির্জন মুহূর্তে অনধিকার-প্রবেশ করতে চায় না। দিনে কতোটুকু সময় আর সঙ্গদান করতে পারে ভাস্বতীকে শমীন! কিন্তু প্রত্যেক স্বামীরই উচিত স্ত্রীকে যথেষ্ট সঙ্গদান করা। হোক তা বিদেশী প্রথা। তবু বুশ-শার্ট-ট্রাউজারের মতো তা আমাদের গ্রহণ করা উচিত।

ছুটির পর ট্রাম-রাস্তাটুকু পর্যন্ত মায়াদি সুপ্রীতির সঙ্গ নেয়। স্কুল-রিফর্ম নিয়ে যতো তাঁর কথা। পড়ার বিষয় এতো বেড়ে গেছে আর মেয়েরা এতো কম বয়েসে আজকাল পড়াশুনো করে যে, ওদের মাথায়

ধরে না এতো পড়া। ক্লাশ সিক্সের মেয়েদের সিঁড়ির অঙ্ক বোঝাতেই তাঁর দু'দিন লাগল। কী করবে মেয়েরা? ইংরেজি-হটাও-ওয়ালারা ওদের উপর হিন্দি চাপিয়েছে! সুপ্রীতি হেসে বলেঃ "মায়াদি, আপনি বোধ হয় স্বপ্নেও অঙ্ক দেখেন!" বর্ষীয়সী মায়াদি ডুব দেবার মতো করে মাথাটা নেড়ে বলেনঃ "অঙ্কই ত শেখবার। সায়ান্সের গোড়া। শিল্পেরও। হিউম্যানিটিস পড়ে কী হবে আজকের দিনে?"

মায়াদি বালিগঞ্জের দিকে থাকেন। বি-টি পড়বার সময়, সেই সুদূর যৌবনে, তীর্থপতি-র এক টীচারের সঙ্গে ভাব হয়ে বিয়ে হয়। তা-ই রটনা। সত্য কি মিথ্যে জানবার উপায় নেই। পারিবারিক কোনো আলাপ তাঁর মুখে নেই। যখন টীচার্সদের বেতন-বৃদ্ধির দাবী জানিয়ে কলকাতার রাস্তায় মিছিল বেরিয়েছিল, মায়াদি ছিলেন আগেকার দিনে। তখন নাকি তিনি কমিউনিষ্ট ছিলেন। এখন চীন আক্রমণে দল ছেড়ে দিয়েছেন। তা-ও গুজব। মায়াদি এ নিয়ে কোনো কথাই বলেন না। পড়ানোর অসুবিধে নিয়ে তাঁর যতো নালিশ। তিনি বলেনঃ "যা পাঠ্যের বহর, তাতে ক্লাশ টুয়েলভ্ পর্যন্ত ক্লাশ হওয়া উচিত!" "স্কুলে ছুটিও বেশি। ধরুন, গ্রীষ্মের ছুটির কী দরকার?" সুপ্রীতি বলে। মায়াদি উৎসাহিত হয়ে বলেনঃ "এসব দিকে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া দরকার। এন্তার স্কুল করে চলেছেন, আর কিছু না।"

আশুতোষ মুখার্জি রোডে এসে মায়াদি রাস্তার ওধারে ট্রাম ষ্টপে চলে যান। তখন বাড়ির কথা ভাববার অবসর পায় সুপ্রীতি। সবার আগে পিকলুকেই মনে পড়ে। তার জন্যে প্রায়ই একটা-কিছু কিনে নেওয়া চাই তার। টফি পেলে যেমন খুশী ও, তেমনি নতুন গুড়ের সন্দেশে বা দার্জিলিং কমলায়। ভাস্বতী বলেঃ "পিকলু শেষটায় তোমার কাছেই শোবে, আমার কাছে নয়।" সুপ্রীতি উত্তর দেয়ঃ "বাচ্চাদের কাছে পপুলার হওয়াই ত টীচারদের কাজ। নইলে আর কোন্ সুখ আছে বলো!"

॥ নয় ॥

সুলেখা দত্ত এখনো আসেনি। ঘর খালি হলে সে আসবে। গীতা একাই ঘরে আছে। তবে লতিকা প্রায়ই এসে আড্ডা দেয়। তাই একা মনে হয় না। নিরঞ্জনের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়ে যাবার পর একটু খোলামেলা কথা বলছে গীতা, আগেকার গাম্ভীর্য আর নেই।

সুষমাদি প্রায় শোনাচ্ছিলেন সুলেখা আসবে, সুলেখা আসবে। গীতা সুপ্রীতির ভঙ্গী নিয়ে বললে "সুলেখা ত কালি, সে আবার মানুষ নাকি?"

"গীতা-ও ধর্মগ্রন্থ, তা-ই না!" কাউকে ব্যথা দিয়ে কথা বলেন না বলেই সুষমাদি গীতার অধার্মিকের মতো কাজের ইঙ্গিত দিলেন না।

"না সুষমাদি, এই গীতা মানে গান যে ভালোবাসে!" লতিকা উত্তর দেয়।

"আপনাদের দিনে সু-দিয়ে খুব নাম হত, না? আপনি সুষমা, আসছেন যিনি সুলেখা, যে গেল সে সুপ্রীতি!" অন্য কথায় যায় গীতা।

"সু-রা এখন সিনেমায়।" লতিকা বলে।

সুষমাদি হাসেন। গীতাকে জিজ্ঞেস করেন: "তুমি কবে যাচ্ছ?"

"গেলেও আমার জন্যে কিন্তু একটা জায়গা রাখবেন, সুষমাদি!" গীতা বলে।

'কেন?"

"এখনকার বিয়ে হতেও দেরি হয় না, ডিভোর্সেও দেরি হয় না।"

"ছিঃ! ডিভোর্সের কথা ভেবে কেউ বিয়ে করতে যায় না কি!"

"পতিব্রতা হবে ভেবেও কেউ বিয়ে করে না আজকাল।"

গীতার কথাগুলো শুনতে ভালো লাগে না সুষমাদির। মনে-মনে

হয়ত তিনি বলেন, টীচারদের কথায় যে ব্যালেন্স থাকা উচিত, তা গীতার নেই। কিন্তু তিনি হাসেন। হাসেন এবং নিজের ঘরে চলে যান।

গীতাকে একা পেয়ে লতিকা জিজ্ঞেস করেঃ "তোমার এখন কেমন লাগছে গীতাদি?"

"মনে হচ্ছে বিয়ে করলেই জীবনের মানে খুঁজে পাব?"

"তা-ই পাওয়া যায় বুঝি?"

"চাকরি করতে এসে ভাবতাম, নিজে উপার্জন করে স্বাধীন হতে পারলেই বুঝি জীবনের মানে পাওয়া যাবে।"

"পেলে?"

"না।"

"বিয়ে করে পাবে?"

"তা জানিনে।"

"জীবনের আবার মানে কী? কয়েকদিন বাঁচা তারপর মরে যাওয়া।"

"সেই বাঁচাটা কেমন হবে তা-ই নিয়েই ত যতো ভাবনা।"

কী যে ভাবনা লতিকা বোঝে না। বিয়ের কথায় মনটা একটু খারাপ হয়, নইলে ত সে বেশ আছে। নীচের ক্লাশের মেয়েদের বাংলা পড়ায়। তৈরী হতে হয় না মোটেও। অবসর সময়ে ঘরে বসে সেলাই করে, নইলে উল বোনে। আজ যে কালো উলের জামাটা পরে আছে সে, তা ত তার নিজের হাতে বোনা। কালো জামার সঙ্গে ধবধবে শাদা-শাড়ি বেশ মানায়। চুলে দু'টো বেণী করে দাও, চুলের আর জামার কালো ঘেরে ঘাড়টা অনেক বেশি ফর্সা দেখাবে। রূপ চর্চার এসব খুঁটিনাটি তার জানা। মাঝে-মাঝে তা করে সে আনন্দ পায়।

গীতার সৌভাগ্যে লতিকা হয়ত বা একটু ঈর্ষান্বিত। ঘরে এসে তৃপ্তিকে বলেঃ "কে ভাবতে পেরেছিল গীতাদি প্রেম করতে পারে!"

তৃপ্তি চুপচাপ বসেছিল। তার মন যেন এ জগতে নেই।

লতিকা আবার বললে : "তৃপ্তিদি, শুনলে কী বললাম ?"

"ওরকম গম্ভীর মেয়েরা যখন প্রেমে পড়ে, বিয়ে না করে ছাড়ে না।" তৃপ্তি মুখ খোলে।

"আমি ত ভাবতাম গীতাদি কথাই বলতে জানে না, স্কুলের মেয়েদের সঙ্গে ছাড়া।"

"প্রেমে পড়তে কি কথা বলতে হয় ? তুমি পুরুষের কাছে গিয়ে দাঁড়াও, সে বলবে : তুমি আমায় ভালোবাসো ? তুমি 'হুঁ' বললেই হল।"

"যা-ই বলো তৃপ্তিদি, বিয়ে করাটা ভালো। ক'জন মেয়ে আর বিয়ে না করে থাকে। যারা থাকে তাদের নিয়ে কতো আজে-বাজে কথা হয়। শুভাদি কী সব বলেন, শোননি ?"

"মেয়েতে মেয়েতে বিয়ে যদি হত আমি রাজি ছিলাম। পুরুষ একটা জাত যাদের সঙ্গে থাকা যায় না।"

"কী সব কথা যে বলো, তুমি !" লতিকা হাসতে থাকে।

"ছেলেবেলায় পার্কে যখন দোলনায় চড়তে যেতাম, একটি মেয়ের সঙ্গে এম্নি ভাব হয়েছিল যে তাকে বিয়ে করতে পারতাম।"

"তোমাকে দেখলে কী মনে হয় জানো তৃপ্তিদি ? 'রক্তকরবী'র রাজার মতো যেন তুমি সবসময় ক্ষেপে আছো !"

"নিজের উপরই নিজে আমি ক্ষ্যাপা। মেয়ে হয়ে জন্মেছি বলে !"

"না ক্যারিয়ার তৈরী করতে পারছ না বলে।"

"সুলেখা দত্ত ত আসছেন। ক্যারিয়ার গার্ল। জিজ্ঞেস করে গ্যাখো তিনি সুখী কি না !"

"তুমি না হাত দেখাতে কালিঘাট কোন্ সাধুর কাছে গিয়েছিলে তৃপ্তিদি ! ভবিষ্যৎ কী জেনে এলে !"

"আগামী বছর শুভ।"

"শুভবিবাহ ?"

দেয়ালে এসে কখন একটা প্রজাপতি বুঝি বসেছিল। ওদিকে চোখ যেতেই লতিকা বলে উঠল : "আয় বাপু আয়—তৃপ্তিদির গায়ে এসে বোস্। ঠিক সময়ে তুই এসে হাজির !"

তৃপ্তি লতিকার দৃষ্টি অনুসরণ করে বল্‌লে : "ও ! ওকে গীতার ঘরে পাঠিয়ে দাও।"

"গীতাদির সময় এখন প্রজাপতির ডানার রঙে এম্নিতেই রঙীন। তোমার কাছেই থাক ও।"

লতিকা হয়ত সুখীই হয়, তাদের ঘরে যে প্রজাপতি উড়ে এলো। দাদারা তার বিয়ের চেষ্টা ত করছেনই কিন্তু পণের দাবিতে হয়ত এগোতে পারছেন না। 'পণের দাবী নেই—পাত্রী চাই' এমন একটা বিজ্ঞাপন খবরের কাগজে দেখে লতিকা একবার চিঠিও লিখেছিল। ফটো পাঠায়নি। তাই হয়ত উত্তর এলো না। ছেলেরা কি আজ-কাল বসে থাকে ? একটা চাকরি পেলেই ভারি হাতে পণ নিয়ে বিয়ে করে ফেলে।

খানিকক্ষণ চুপ থেকে লতিকা বলে : "তৃপ্তিদি, তুমি ধর্ম মানো ?"

"সুষমাদি সরস্বতীপূজোর তোড়জোড় করে যেম্নি মানেন, তেম্নি মানিনে।"

"তবে ?"

"আমি মনে করি, মনের একটা আশ্রয় ধর্ম। আমি যদি কবিতা লিখতে পারতাম, কবিতাই হ'ত আমার ধর্ম।"

"তুমি সব অদ্ভুত কথা বলো।"

"আমি আমার কথাই বলি, অদ্ভুত শোনালে কী করব ?"

"জীবনটাকেই তুমি বাঁকিয়ে দেখতে শিখেছ, সোজাভাবে নয়।"

"সোজা রেখায় জীবন চলতে পারে কখনো ? বিশ্ব-জগৎই, বিজ্ঞানীরা বলেন, বাঁকা।"

লতিকা সুখ পায় না, গীতার সঙ্গে কথা বলেও না, তৃপ্তির সঙ্গেও না। সুপ্রীতিদি থাকতেই ভালো ছিল। এই বিকেলগুলো কাটত ভালো। সুপ্রীতিদি এঁদের মতো সিনিক নন। হয়তো তার মতোই খানিকটা ধার্মিক। জীবনে যে ভালো বলে কিছু আছে তা মানেন।

মন-খারাপ করে ছোড়দার কাছে চিঠি লিখতে বসে লতিকা। সে-ও

প্রফেসর। বিয়ে করেনি। তাকে জানায়ঃ আমাদের 'সানি কর্টে'রই এক টীচারের সঙ্গে এক প্রফেসরের বিয়ে হচ্ছে। খবরটা জানাবার পেছনে নিজের বিয়ের খবর জানবার ইচ্ছেটা গোপন রইল। এ চিঠির উত্তরে তার যদি একটা সুখবর আসে!

। দশ ॥

উত্তর কলকাতার একটা হোটেলে থাকত নিরঞ্জন। গীতার সুবিধের জন্যেই দক্ষিণ কলকাতায় ছোট একটা ফ্ল্যাট খুঁজছিল সে। একমাস খোঁজার পর কিছু দালালি দিয়ে রমেশ মিত্র রোডে একটা দু'ঘরের ফ্ল্যাট জুটল। নইলে বিয়ের দেরির আর কোনো কারণ ছিল না। বিয়েব কয়েকদিন আগেই গীতা 'সানি কট' ছেড়ে ও বাড়িতে চলে গেল। তারপর একদিন নিরঞ্জনকে সঙ্গে নিয়ে 'সানি কট'কে নিমন্ত্রণ করতে এলো। বিয়ের ত কোনো হ্যাঙ্গাম নেই। রেজিস্ট্রেশন অফিসে যাওয়া আর আসা। একটি প্রীতিভোজ হবে, তারই নিমন্ত্রণ। নিমন্ত্রিতের সংখ্যা বেশি নয়। 'সানি কটে'র এরা, সুপ্রীতি-ভাস্বতী আর নিরঞ্জনের কয়েকজন প্রফেসার বন্ধু। দু'ঘরে কোনোরকমে জায়গা হয়ে গেল।

ইকনমিক্সের প্রফেসার অরুণ হালদার তাঁর এলাকার বাইরে কথা বলেন না। তাঁর দৃঢ় ধারণা ফ্যামিলি প্ল্যানিং না হলে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে। জনসংখ্যা যে কী পরিমাণ স্ফীত হচ্ছে তার ভয়াবহ অঙ্কগুলো তিনি শুনিয়ে দিচ্ছিলেন আশে-পাশের শ্রোতাদের।

সুপ্রীতি হেসে বললে: "ভারতের আদ্ধেক লোকের অবিবাহিত থাকা উচিত, না কী বলেন?"

"হলে ত ভালোই হত!" অরুণ হালদার শরীরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন।

ইংরেজির প্রফেসার, নিরঞ্জনের সিনিয়ার, নীরেন সোম পাইপটা হাতে নিয়ে বললেন: "বিয়ের নিমন্ত্রণে এসব কথা আনসোশ্যাল।"

সুষমাদি পরিকল্পনার আলাপে উৎসাহী, বললেন: "পরিকল্পনাই ত আমাদের ভবিষ্যৎ গড়বে। আমার বাবা-মা সিউড়িতে থাকেন, যখনই আমি সেখানে যাই, রোজ একবার ময়ুরাক্ষী-বাঁধ দেখে আসি। কী যে ভালো লাগে দেখতে।"

মেয়েদের কাছে পাইপ-টানার অনুমতি নীরেন সোম আগেই নিয়েছিলেন। পাইপটা মুখে তুললেন এখন: "আমার ভার্জিনিয়া উলফের সে-কথাটাই মনে পড়ছে। আজ নিশ্চয়ই নিরঞ্জন আর গীতার মনে হচ্ছে, 'Life is a luminous halo'—আমাদেরও এই হ্যালোড দিনটা উপভোগ করা উচিত।" নীরেন কথাগুলোই চিবুলেন না পাইপটা, বোঝা গেল না।

এই এালটের সংসর্গটা ভালো লাগছিল কৃষ্ণার। কথা বলছিল না। শিরা-ভাসানো রোগা হাতে গলার বেঁটে মোটা হারটা টানাটুনি করছিল।

তৃপ্তি চুপচাপ। সুপ্রীতি ভাবলে, তার মনের যন্ত্রণা বুঝিবা এখনো চলছে। তৃপ্তিকে ডেকে সে বললে: "শোনো তৃপ্তি, নীরেনবাবু কী বলছেন। জীবন-দেবতার পুজো করতে শেখো।"

দূরে বসে তৃপ্তি উত্তর দেয়: "সে-পুজো রবীন্দ্রনাথকেই মানায়।"

ইতিহাসের প্রফেসার প্রিয়তোষ বলেন: "রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন বলে কি আমরা করব না? অতীত বলে কিছু নেই? সব অতীতই বর্তমানে উপস্থিত।"

তৃপ্তি অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

নিরঞ্জন মিশুক। সুযোগ পেয়ে তার সঙ্গে লতিকা আলাপে জমে যায়। সোজা নাক, উজ্জ্বল চোখ, পাতলা ঠোঁট নিরঞ্জনের। অ্যাপলো মোটেও নয় কিন্তু আকৃষ্ট হবার মতো যথেষ্ট সৌষ্ঠব আছে চেহারায়।

"কে জিতল, আমি ভাবছি। আপনি না গীতাদি!" লতিকা বলে।

"এ কি যুদ্ধ যে হারজিতের কথা আসবে?" ইংরেজি বলার অভ্যাসে বাংলাও একটু জড়িয়ে বলে নিরঞ্জন।

"এখনকার মেয়েদের খানিকটা মনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয় না বিয়েতে রাজি হবার আগে?"

"তা হলে তা আপনার গীতাদিকে জিজ্ঞেস করুন।"

"মেয়েদের মন ত আমি জানি। পুরুষদের কথাই জানতে চাইছি।"

"পুরুষদের জায়গা-বাসার অভাবের কথা আর রোজগারের অঙ্কটার কথা ভাবতে হয়।"

"ছোটো ঘরখানি মনে কি পড়ে সুরঙ্গমা!" বেশ ত ছোট দু'খানা ঘর হয়েছে আপনাদের! যদি কোনোদিন বড়ো বাড়িতে যান, কবিতার লাইনটা শোনাবেন গীতাদিকে। মনে রাখবার মতো দিনগুলো ত এখন এই ছোট ঘরেই কাটবে।"

কথা থেমে যায়। সুপ্রীতি এসে উপস্থিত হয়। সে শুধু ঘুরছে। এখানে-সেখানে। এসেই নিরঞ্জনকে বললে: "আপনি ত বেশ মানুষ! বিয়ের ছোঁওয়া লাগিয়ে দিলেন 'সানি কটে'। এখন আমরা লতিকাকে নিয়ে যাই কোথায়?"

"আপনাদের মধ্যে গীতাই যে প্রথম সিঁদূর পরল, তা-ত নয়—উনি পথ দেখিয়েছেন—" ভাস্বতীকে দেখাল নিরঞ্জন।

"ভাস্বতী ত 'সানি কটে'র মেয়ে নয়! তা ছাড়া, ভাস্বতী বিয়ে করেনি—তাকে বিয়ে দিয়েছে। শাঁখ বাজিয়ে, উলু দিয়ে, পুরুৎ ডেকে শানাই-এর সুর তুলে রীতিমতো বিয়ে। শমীনবাবুর চারদিকে সাত পাক ঘুরতেও হয়েছে কলুর বলদের মতো। চোখ দুটো বেঁধে দিলেই ঠিক হত!" হেসে ওঠে সুপ্রীতি।

হাসির তোড়েই হয়ত ভাস্বতী নীরেন সোমের আড্ডা থেকে সরে এদিকে চলে আসে।

"আপনার সঙ্গে কথাই হল না।" নিরঞ্জন বলে ভাস্বতীকে: "আপনার সঙ্গেই ত খোলাখুলি আলাপ করা যায়। কারণ আপনি বিবাহিতা! এঁরা বিয়ের কী বোঝেন?"

ভাস্বতী ভদ্রতার হাসিতে বলে: "সুষমাদির সঙ্গে অনেকদিন দেখা নেই—ওঁর সঙ্গেই কথা বলছিলাম।"

"লতিকা—" সুপ্রীতি লতিকার কানে-কানে কিছু বলবার ভঙ্গী দেখায় কিন্তু আস্তে বলে না কথাগুলো: "তুমি ত পুরুষদের সঙ্গে আলাপ জমাতে চাও। নিমন্ত্রণ-বাড়িতেই কিন্তু তার সুযোগ!"

"ও, তা-ই নাকি ?" নিরঞ্জন টেনে টেনে হাসতে সুরু করে ঃ

"সরোজ ত এলো না। বাংলার লেকচারার। ব্যাচেলার। উনি বাংলা কবিতা আওড়াচ্ছিলেন, সরোজ মিত্তির খুব ইম্প্রেসৃভ হত।"

"হঁ্যা—মিত্তিররাই ত এখন সাহিত্যের দলে ভারি।" সুপ্রীতি এদের ছেড়ে গীতার খোঁজে চলে যায়।

গীতা অন্য ঘরে চা-খাবার তৈরীতে ব্যস্ত ছিল। সুপ্রীতি তার কাছে দাঁড়িয়ে বললে ঃ "খুব খুশী হলাম, গীতা, নিরঞ্জনবাবুর সংগে আলাপ করে। কিন্তু একটা কথা তোমায় বলে দিচ্ছি, বাচ্ছাকাচ্ছা-হলে কিন্তু আমি মোটেও আসব না। আজকালকার বাচ্ছাগুলোর কী মাথা-খারাপ, ব্বাবা !"

"বাজে কথা রাখো !" গীতা বলে ঃ "কী তুমি খাবে বলো, দেখছ ত বেশি-কিছু করতে পারিনি ! পয়সা কোথায় ? বাড়িবাবদ অনেক টাকা গেছে !"

"কী আবার খাবো ? সব খাবো।"

"লোক নেই, জন নেই—এক ওই ঝি সহায় !"

"এমন আন্সোশ্যাল বিয়ে করতে গেলে কেন ?"

"নিমন্ত্রণও কি সব টীচারকে করতে পারলাম ! জায়গা হবে কোথায়।"

"বিয়ে এমন একটা ঝুঁকি, যে বিয়ে করে তাকেই বরং খাওয়ানো উচিত। সে খাওয়াবে কেন ?"

গীতার সঙ্গে কাজে বসে যায় সুপ্রীতি। ক'টা কী দিতে হবে তা সে-ই বলে দেয়। পটে চা ভেজায়। গীতাকে বলে ঃ "অতিথিদের সঙ্গে আলাপে বসতে হয়—তুমি যাও, আমি এসব নিয়ে আসছি।"

গীতা দ্বিরুক্তি না করে উঠে ও ঘরে চলে যায়।

॥ এগারো ॥

সুলেখা দত্তরও নিমন্ত্রণ ছিল কিন্তু সে যায়নি। বাড়ি ছেড়ে এখানে এক ঘরে এসেছে। সে পড়াশুনো করবার জন্যে, নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্যে নয়। জর্জীয়ান যুগের পর ইংরেজ ইমেজিষ্ট কবিদের নিয়ে তার থিসিস। অন্তত এক বছর খাটতে হবে। এক বছর ত 'সানি কটে' আছেনই। বাড়িতে অসুবিধে। মার সঙ্গে এক ঘরে থাকতে হয়। অন্যান্য ঘরে তার দাদার পরিবার, ভাই-এর পরিবার। সুলেখা শুনুক আর নাই শুনুক তাকে ঘরে পেলেই মা ছেলে-নাতিদের বা বৌদের বিরুদ্ধে যতো অভিযোগ তাকে শোনাবেনই। আপন মনে কথা বলার মতো করে তিনি বলে যান। বলাতেই তাঁর শান্তি। মেয়ের কাছে আর কী প্রতিকার চাইবেন? সুলেখা বলে এসেছে, রবিবার-রবিবার গিয়ে থাকবে মার সঙ্গে, কিন্তু এক বছর পড়াশুনো করবার জন্যে তার নিরিবিলি একটা ঘর চাই। সুষমার কাছে পাওয়া গেল, তাই যাচ্ছে। সুপ্রীতি আর গীতা যে-ঘরে থাকত সে-ঘরই এখন সুলেখার।

রাত্রি আটটার মধ্যেই ফিরে এলেন সুষমাদি, দলবল নিয়ে। সুলেখার ঘরে উঁকি দিয়ে দেখলেন সুষমাদি, সে নোট নিতে ব্যস্ত। চুপচাপ নিজের ঘরে এসে শাড়ি-ব্লাউজ পাল্টে বিছানায় শুয়ে পড়লেন যা তিনি কোনোদিন করেন না। খাবার আগ-পর্যন্ত ন'টা কিছু-না-কিছু তাঁর করবার থাকে। আজ যেন কোনো কাজই খুঁজে পেলেন না। গীতার ওখানে কথা বলেছেন বেশি, পরিশ্রান্ত হয়েছেন এমন নয়। তবু যেন কেমন ভার ভার লাগছিল মনটা।

সুলেখা সারাজীবনই লেখাপড়া করল। ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে যদি একটা ঘর পেত, নিশ্চয়ই সেখানে গিয়েই থাকত সে। আমি আর কী পড়ি—ভাবেন সুষমা ঘোষ—পড়ি মেয়েদের ষ্টোরিবিল্ডিং শেখাবার জন্যে। সমরশেট মম ভালো লাগে প্রাচ্যের ধ্যান-ধারণা

খানিকটা আছে বলে। কিন্তু আজ ত পড়তেও ইচ্ছে করছে না। ভাস্বতী খাঁটি গিন্নী হয়ে গেছে—চিবিয়ে চিবিয়ে অল্প কথা বলে। কিন্তু তার চাইতে বয়েসে কতো ছোট ভাস্বতী। গীতা ত আরো ছোট। গীতার বয়েসই হয়ত বিয়ের শেষ বয়েস। অনেক আগেই আমি পেরিয়ে এসেছি সে-বয়েস! আমি কি কখনো বিয়ের কথা ভেবেছি? না। বাবা-মা? না, তাঁরাও ভাবেন নি। একটা অতীত যন্ত্রণার মতোই বিষণ্ণ করে দিল কথাগুলো সুষমা ঘোষকে। এ কি লিবিডো! চমকে ওঠেন তিনি।

ঘরে কৃষ্ণা খুটখুট করছে। সে-ও বই নিয়ে বসেনি। আজ গীতার বাড়ি থেকে এসে হঠাৎ কেমন যেন নিজেকে বড়ো একা মনে হ'ল। একটা ডিপ্রেশানে যেন ভুগছে মন। সমুদ্রের ডিপ্রেশানে ঝড় ওঠে। তার মনেও কি ঝড় উঠবে। ক্যারিয়ার তৈরী করবার নেশা ছুটে যাবে তার? আর্ত হয়েই যেন ডাকল সে: "সুষমাদি—"

সুষমা ঘোষ বিছানায় উঠে বসেছিলেন। বললেন: "কী? কী হল তোমার?"

"পড়ায় মন যাচ্ছে না কেন, বলুন ত!"

"একটা অন্যরকম আবহাওয়া থেকে এলে কিনা!"

"তাই হয়ত।" খোঁপা খুলে চুলে চিরুণী চালাতে সুরু করলে কৃষ্ণা।

উঠে সুলেখার ঘরেই গেলেন সুষমা ঘোষ। যেন মনের উপদ্রব থেকে বাঁচতে; নিরাপদ আশ্রয়ে।

তৃপ্তির ঘরে তৃপ্তি চুপচাপ বসে আছে, যেমন আজকাল প্রায়ই সে থাকে।

অতি যত্নে তৈরী খোঁপায় হাত ছুঁইয়ে-ছুঁইয়ে লতিকা প্রফেসারদের কথা ভাবছিল। সবাই গীতার সঙ্গে কথা বলতে উৎসুক। তারা যেন কেউ নয়। অগত্যা সে গীতাকে একা পেয়ে জিজ্ঞেস করেছিল: "বিয়ের পর থেকে তোমার কেমন লাগছে গীতাদি?"

"একই রকম।"

"একই রকম? দূর, তা কি হয় কখনো?"

"বিয়ে করে ছাখো।"

গীতার কথাগুলো মনে এনে লতিকা ভাবছিল, বিয়ে সে করবেই। না ত কী রোজ এগারোটা থেকে চারটা পর্যন্ত বাচ্চা মেয়েদের পড়া মুখস্থ করিয়ে চলবে! তাদের চেঁচামেচিতে মাথা ঠিক থাকতে পারে কারো! এ একটা কী জীবন? টাকা পাওয়া যায়। কিন্তু টাকা পাওয়াটাই কি সব? ছোড়দার চিঠি এলো না। চিঠি না এলে ছুটি নিয়ে সে চলে যাবে মেদিনীপুর। বৌদি অবশ্যি তাকে ট্রেস্‌পাসার ভাবেন, ভাবেন ভাই-এর সংসারে বোনরা আবার কেন? বেশত, আসবে না বোনরা। বিয়ে দিয়ে দাও।

খেতে খেতে রাত দশটা হয়ে গেল। আর আর দিনের চাইতে এক ঘণ্টা দেরি। সুষমা ঘোষই কামিনীকে বলে গিয়েছিলেন, দেরি হলে ক্ষতি নেই।

সুলেখা যা-কিছু কথা বলে খাবার টেবিলেই। বললে সে: 'নিমন্ত্রণ খেয়ে এসেও বাড়িতে খেতে হচ্ছে তোমাদের?"

"সবই শর্টকাট। যেম্নি বিয়ে, তেম্নি ভোজ।" সুষমা বললেন।

"তা-ই হওয়া উচিত—" ভাত খুঁটে খুটে সুলেখা বলতে সুরু করলে: "বিয়ে বাড়ি আমার একটা বিভীষিকা! চোখ-ধাঁধানো শাড়ি-গয়না আর মাংস-পোলাও-এর গন্ধে হাওয়া ভুরভুর! ঈশ্‌!"

"আপনি কম খান কিনা সুলেখাদি, তাই আপনার এ নশিয়া!" লতিকা বলে।

"কম আজ আমরাও খাবো। আধ-পেট ত অন্তত খাওয়া হয়ে গেছে!" কৃষ্ণা সুলেখাকেই উদ্দেশ করে।

"আমি ত কম খাইনে।" সুলেখা শোনায়: "খেতে বসে কথা বলি ত শুধু বেশি খাওয়ার জন্যে। বামুনরা যে কেন খেতে বসে বোবা হতেন বুঝতে পারিনে।"

তৃপ্তি একটা কথাও বলেনি। চুপচাপ খেয়ে চলছিল।

সুলেখা তার দিকে তাকিয়ে বললে : "তৃপ্তি সত্যিকারের বামুনের মেয়ে।"

"শরৎ চাটুয্যের ?" হাসতে থাকে লতিকা।

"না-না।" হেসে মাথা দোলায় সুলেখা : "ছাখো না বোবা হয়ে আছে।"

"মেজাজটা বিগড়ে আছে তৃপ্তির—" সুষমা কারণ দেখান : "পুরুষদের ও সহ্য করতে পারেনা।"

"ও, তা-ই বুঝি ? সুলেখা কথা কমিয়ে আনল।

তৃপ্তি টু-শব্দটি করলে না। যেন তাকে নিয়ে কোনো আলোচনা হচ্ছে না, এমনি ভাব দেখাল সে।

তারপর আর কথা জমল না। যে যার খাওয়া শেষ করে উঠে গেল।

অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম হল না তৃপ্তির। তারপর আধো-ঘুমে স্বপ্ন দেখল, তাদের বীডন ষ্ট্রীটের বাড়িতে সে শুয়ে আছে। কিন্তু কী ভীষণ শীত। সারা শরীরে শীতের কামড় ! এম্নি সময়ে কে যেন তার ঘরে এলো। সুপ্রীতি। হাতে তার একটা কালো কম্বল। কী করে যেন জেনেছে সে তৃপ্তি যে শীতে যন্ত্রণা পাচ্ছে। কম্বল দিয়ে তৃপ্তির সমস্ত শরীর ঢেকে দিল সুপ্রীতি। কম্বলের নীচে হাত-পা-মাথা গুটিয়ে নিচ্ছে তৃপ্তি—ছোট হয়ে যাচ্ছে, ছোট হয়ে যাচ্ছে। কী আরাম ! শীত আর নেই।

স্বপ্নও নেই আর। ঘুম ভেঙে গেল।

"ছেলেবেলাকার কিছু-না-কিছু অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা সবারই থাকে, তৃপ্তি, তাকে মনে পুষে রাখতে নেই।" যাবার আগে সুপ্রীতি বলে গিয়েছিল তাকে। মনে পড়ল তৃপ্তির। সত্যি, সে পুষে রেখেছে। ভুলতে পারছে না সেই দাদাকে।

।। বারো ।।

সকালে চায়ের টেবিলে দুধের বাটি নিয়ে সবার আগে বসে পিকলু ডাকতে স্নুরু করেঃ "মা এসো, বাবা এসো, প্রিটি এসো, মীটিং হবে!" শমীন আর ভাস্বতী এক সঙ্গে এসে বসে। সুপ্রীতির আসতে হয়ত একটু দেরি হয়। সুপ্রীতি এলেই পিকলু বলবেঃ "প্রিটি, মীটিং করো।"

"তোমাকে বাইবেলের প্রার্থনা করাতে হবে রোজ, বুঝেছি।" সুপ্রীতি বলে।

শমীন সুপ্রীতির সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ হারায় না। বলেঃ "বাচ্চাদের তেমন কিছু শেখাবার থাকলে ভালো হত!"

"থাক্. ছেলেকে আর ধার্মিক বানাতে হবে না।" ভাস্বতী বলে।

সুপ্রীতি মাথা নীচু করে রাখে। শমীনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভাস্বতীকে কথা বলতে সে এই প্রথম শুনল।

পিকলু চেঁচামেচি করে ওঠেঃ "প্রিটি, মীটিং করো।"

চা-টোষ্ট দিয়ে গেল নিতাই।

সুপ্রীতি মুখ তুলে পিকলুকে বললেঃ "এই ত করছি। দুধে চুমুক দাও, তারপর "

দুধে চুমুক দিল পিকলু।

সুপ্রীতি হেসে হেসে বলতে লাগলঃ "পিকলু দুধ খায়। তার পয়সা বিহারী গয়লাদের হাতে চলে যায়। বাঙালীদের অনেক চা-বাগান আছে। আমরা সে চা খাই। বাঙালীরা পয়সা পায়। পিকলু যদি দুধ ছেড়ে চা না ধরে তাহলে তাকে দিল্লীতে ফের পাঠিয়ে দেওয়া হবে। কেমন?"

গভীর মনোযোগে শুনতে থাকে পিকলু। ভাস্বতী বলেঃ "মীটিং হয়ে গেল। প্রিটি এখন চা খাবে। তুমি খেলা করো গে যাও।"

শমীন চায়ে চুমুক দিয়ে সুপ্রীতিকেই বলে : "দুপুরের খাওয়াটাও ত আপনি আমার সঙ্গে সেরে নিলেই পারেন।"

"আপনি ত খেতে বসেন ন'টায়—সেটা দুপুরের খাওয়া নাকি ?"

"আপনি না হয় এক ঘণ্টা পর—তা এক ঘণ্টা এগিয়ে আনতে দোষ কী ?"

পিকলু তখনো যায়নি। ভাস্বতী তাকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

টোষ্ট চিবোয় সুপ্রীতি, কথা বলে না।

শমীন বলে। টীচারিতে স্বভাবটা রুটিনমাফিক হয়ে যায়—তা-ই না ?"

সুপ্রীতি হাসে : "টীচারিতে আর কী-কী দোষ হয় বলুন ত শুনি ? ভাস্বতীর নাম ত কাটিয়ে নিলেন। আপনার সঙ্গে সুষমাদির দেখা হওয়া উচিত, বুঝিয়ে দিতেন" টীচারি কী মহৎ কাজ।"

"ঘরকন্নাটা আরো মহৎ। রান্নার মান নীচুতে নেমে গেছে কেন জানেন ? আপনারা কেউ রাঁধতে চান না। রান্নার ঐতিহ্যই নষ্ট হয়ে গেছে !"

"আপনার তাতে দুঃখ করবার কী আছে ? ভাস্বতী ত চমৎকার রান্না করে।"

"সবাইকে করতে হবে। রান্নার লোক আর পাওয়া যাবে না। তারা সবাই ফ্যাক্টরীতে কাজ নিয়ে চলে যাচ্ছে।"

ভাস্বতী এলো।

"তোমার চা জুড়িয়ে গেল, ভাস্বতী।" সুপ্রীতি বললে : "আমি যে লোভী তা ত জানোই। খেতে সুরু করে দিয়েছি।"

ভাস্বতী একটু হেসে সুপ্রীতির পাশে বসল।

"আপনি লোভী ?" কথা কেড়ে নিলে শমীন : "জানো ভাস্, আমার মনে হচ্ছে, ওঁর খাওয়া-দাওয়া একদম হচ্ছে না। লক্ষ্য করেছ, রাত্রিতে দু'গ্রাসও যে মুখে নেন না !"

"ওর 'সানি কটে'র শোক যায় নি। কেমন ত?" ভাস্বতী সুপ্রীতির মুখে তাকায়।

"আমি স্কুল থেকে এসে হেভি টিফিন করি—তুমি দেখছ না? একগাদা লুচি আর ম্যাশ্‌ড পটেটো—জানেন?" ফিল্ম ক্যামেরার মতো চোখ ঘোরায় সুপ্রীতি একবার ভাস্বতীর দিকে আরেকবার শমীনের দিকে।

"ইঙ্গ-বঙ্গ খাওয়া?" শমীন হাসে।

"ইংরেজ ভারত ছেড়ে যাবার পর তাদের বিরহে যে আমরা তাদের পোষাক আর ডিশ নিয়েছি সে খবর রাখেন না।"

"রাখবে না কেন? স্টু আর স্যুপের ভক্তের কাছে কী খবর বলছ তুমি?" ভাস্বতী বলে।

চা-খাওয়া শেষ হয়। ভাস্বতী বলে: "পিশিমা ডেকেছেন, আমি উপরে যাচ্ছি। পিকলুকে দেখো—ও গাড়ী নিয়ে খেলছে। কখন কী ভাঙে!"

ভাস্বতী উপরে চলে গেল, শমীন তাদের ঘরে। সুপ্রীতির আলস্য ভাঙে নি। ফাল্গুনের সকালগুলো হাওয়ার তুলিতে আলস্য বুলিয়ে দেয় সারা শরীরে। তার উপর, একটা এলোমেলো খোঁপা বাঁধতে বাঁধতে পিকলুর ডাক শোনা—বাঁশীর সুরেই ডাক—'প্রিটি, এসো!' সমস্ত সকাল যেন সেই সুরের রঙে ভরা।

আরো খানিকক্ষণ চায়ের টেবিলে বসে থেকে সুপ্রীতি তার ঘরে এলো। ছোটখাট ভাবনা মনের উপর দিয়ে চলে যেতে লাগল হাল্কা মেঘের মতো। ভাস্বতীর মেজাজটা কেন ভালো নেই আজ? পিশিমা কেন ডাকলেন ওকে? এ-সময়ে ত মহাভারত শোনেন না। মহাভারত পড়ে পড়ে ভাস্বতীর মোজজটা দ্রৌপদীর মতো ক্ষ্যাপা হয়ে গেছে!

হাওয়ায় উড়ছে চুল। জানালায় দাঁড়িয়ে চুলে চিরুণী চালাল সুপ্রীতি। বেশ খানিকটা সময় কাটে এতে। অন্তত পনেরো মিনিট। সময়, সময়! এই সময়ই ত তার শৈশব, কৈশোর, তারুণ্য নষ্ট

করেছে! মৃত্যুও এনে দেবে এই সময়। সময়ে এমনি জড়িয়ে আছি যে তা থেকে মুক্তি নেই। শুধু ঘুমে মুক্তি।

দরজায় স্যাণ্ডেলের আওয়াজ হয়। সুপ্রীতি ফিরে তাকায়। শমীন। ডাকে সেঃ "আসুন।"

না ডাকলেও সে আসত। ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসল শমীন। দু'হাত তুলে চুলে একটা খোঁপা তৈরী করতে গিয়ে সুপ্রীতি তার পৃথুল বাষ্ট-টা শমীনের চোখের উপর খানিকক্ষণের জন্যে যেন স্পষ্ট করে তুলল।

শমীন হাসছিল। বললেঃ "মিউজিয়ামে গেছেন, কখনো?"

"গেছি। যখন কলকাতায় প্রথম আসি।"

"ঢুকতেই ডানহাতি যে-ঘরটা আছে, সেখানকার লাল পাথরের একটা মূর্তির জন্যেই মিউজিয়াম নাম সার্থক। যক্ষিণী মূর্তি। শুঙ্গ যুগের। সে-কালের মিউজ।"

"কালিদাসের কালের নয়?"

"না-না। বেশ ভরা-ভরা, ভারি-ভারি চেহারা। দেখে আপনার কথাই মনে হয়।"

"তা-ই নাকি? কিন্তু যক্ষিণীরা ত মিউজিক জানতেন। আমি মিউজিকের মিউ-ও জানিনে মানে বেরালের ডাকটাও গলায় আসে না।"

"কিন্তু ছবি আঁকতে ত জানেন। পিকলুকে সুন্দর একটা জাহাজের ছবি এঁকে দিয়েছেন।"

"ছবি আঁকার শখ ছিল, এক বছর শিখেছি।"

"তাহলেই হল!"

"যক্ষিণী বনে গেলাম?" সুপ্রীতির গালে আর ঠোঁটে যেন মোনা-লিসার হাসির ছায়া পড়ল।

"চলুন একদিন মিউজিয়ামে। দেখবেন সে-মূর্তি।"

সরাসরি 'না' বলতে যেন সৌজন্যে বাধে সুপ্রীতির। বলেঃ "সবাই মিলে যাওয়া যাবে একদিন।"

ও ঘরে পিকলু চেঁচিয়ে উঠল: "বাবা, বাবা, গাড়িটা ভেঙে গেছে।"

॥ তেরো ॥

বিয়ের পর কি নতুন-কিছু অনুভব করছে গীতা? ভাবে সে অনেক সময়। যৌন চরিতার্থতা নাকি প্রাণচাঞ্চল্য এনে দেয়। কিন্তু তেমন কোনো অনুভবও ত নেই তার। আনে হয়ত কম বয়সে বিয়ে হলে। স্কুলের কয়েকজন মেয়েরই ত বিয়ে হয়েছে স্কুল-ফাইন্যাল দেবার আগে। দেখা করতে এসেছে টীচারদের সঙ্গে তারা। কী খুশী! সেই খুশীর রঙ গীতা পাবে কী করে? বরং বিয়ের আগে সে বেশি খুশী ছিল। শনিবার-শনিবার নিরঞ্জন যখন তার অপেক্ষায় পার্ক ষ্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকত। কী আগ্রহ-ভরা সন্ধানী দৃষ্টি থাকত গীতার নিরঞ্জনকে নির্দিষ্ট জায়গায় দেখবার জন্যে! নিরঞ্জনের মুখোমুখি এসে গীতা হেসে বল্‌ত: "শুধু পার্ক ষ্ট্রীট! আর কী জায়গা নেই?" নিরঞ্জন উত্তর দিত: "পার্ক ষ্ট্রীটই ত আজকাল City's cuisine Centre হয়ে উঠেছে।" রেষ্টুরেণ্টের দিকে চলতে চলতে গীতা বলত: "রান্না শিখতে বুঝি এখানে আসা!" "ঘণ্ট আর শুকতো খেয়েই ত আমাদের অভ্যাস, এখানে তবু একটু রুচি বদলানো যায়।"

এ সব তুচ্ছ কথাগুলোও এখন মনে পড়ে গীতার। এখন যেন সব কথার, সব আলাপের শেষ। টুকরে যেক'টা কথা হয় তা হয়ত স্কুল নিয়ে বা খাবার মেন্যু নিয়ে।

তবে ছুটির দিনগুলো অন্য রকম। প্রফেসারদের আড্ডা বসে। নীরেন সোম আসবেনই। প্রিয়তোষ ঘোষাল, সরোজ মিত্র, আরো অনেকে অনিয়মিত ভাবে উপস্থিত থাকেন। গীতা এ-সব দিনের অপেক্ষায় যেন উদগ্রীব হয়ে থাকে। এই আড্‌ডাটাই এখন তার যা-একটু ভালো লাগছে।

নীরেন সোম ইংরেজির প্রফেসার, নিরঞ্জন লেকচারার। কিন্তু

পদবীর ব্যবধান ঘুচিয়ে ফেলেছেন তিনি কথা-বার্তায়, মেলামেশায়। কিন্তু নিরঞ্জন তাঁর সামনে বিনীত। কথা বলেন নীরেন সোমই বেশি। গীতাকে প্রথম দিন থেকেই 'তুমি' বলছেন তিনি। বলতে কি, নীরেন সোমের কথার মোহই গীতার বেশি।

নীরেন সোম বলেন: "ছুটির দিনের সকালগুলো আমার কেমন মনে হয় জানো নিরঞ্জন? Earth and sky and air/Are Golden everywhere!"

"ইতিহাসের প্রফেসার প্রিয়তোষ বলে: "ফোর্টিন ক্যারেট না খাঁটি?"

"সে-খবর তুমি বৌ-বাজারে গিয়ে করো—এখানে নয়।" নিরঞ্জন হাসে

"সত্যি, এখানে যখন আমরা তিনজনই অবিবাহিত—" সরোজ মুখার্জি বলে: "এটা ত আর বৌবাজার হতে পারে না!"

নীরেন সোম বলেন: "এঁরা এখন গিন্নী আর গয়নার আলাপ করবেন। তোমার শুনে কাজ নেই। গীতা, তুমি চা আনো।"

খুশী হয়ে চলে যায় গীতা। তিন-চার বার তাকে চা করতে হয়। চা সে ভালো করে। নীরেন সোমেরই প্রশংসা পায় বেশি। তাতে আরো খুশী।

নিরঞ্জন সাহিত্যের দিকে আলাপের মুখ ঘুরিয়ে দিতে চায়। সরোজকে বলে: "তোমাদের বাংলা সাহিত্যে এতোদিন পর বোদলেয়ারের হিষ্টিরিয়া দেখা দিচ্ছে কেন হে?"

চটপট উত্তর দেয় সরোজ: "সে কোনো ফ্রয়েডকে ডেকে জিজ্ঞেস করো।"

কথা চিবোতে সুরু করেন নীরেন সোম: "প্রভাবের দোষই এই যে তাতে আন্তরিকতা থাকে না। ইংরেজি সাহিত্যে যখন বোদলেয়ারের প্রভাব এসেছিল, তখন কতগুলো নিষ্প্রাণ কবিতাই তৈরী হয়েছে। অবশ্যি স্মরণীয় এমন কবিতা-ও আছে:

"But I was desolate and sick of an old passion

When I awoke and found the dawn way gray
I have been faithful to thee Cynara! in my fashion."

প্রিয়তোষ কবিতাটা উপভোগ করল না। নিজের এলাকায় আলাপটা নিয়ে যেতে চেষ্টা করল: "প্রভাব এড়িয়ে চলাই ভালো। মুঘল স্থাপত্য ত কতো বড়ো জিনিম। কিন্তু তার প্রভাবে হিন্দু স্থাপত্যে কি কোনো বড়ো জিনিষ তৈরী হয়েছে?"

নিরঞ্জনের পর্যটনের অভিজ্ঞতা আছে, বলে: "রাজপুতনার সাবিত্রীমন্দিরই গম্বুজ লাগানো। দেখতে খারাপ নয়।"

"তাছাড়া—"নীরেন সোম বলেন: "রাজপুত চিত্রকলার আর মুঘল চিত্রকলার পার্থক্য বোঝাই-ত ভার।"

প্রিয়তোষ কোণঠাসা হয়ে সরোজকে বলে: "কিছু বাংলা কবিতা শোনাও না তুমি।"

সরোজ বলে: "তা আমার চাইতে মিসেস বোস ভালো পারবেন।

"সাইনারা-কবিতার পর বাংলা কবিতা একমাত্র 'বনলতা সেন' চলতে পারে যদিও তার অভিজ্ঞতার চেহারা অন্যরকম।" নিরঞ্জন বলে।

"গীতার মুখে শুনেছি আমি। এনচ্যান্টিং!" পাইপ টানতে থাকেন নীরেন সোম।

রবীন্দ্রভক্ত সরোজ বলে: "কেন, রবীন্দ্রনাথের 'সুন্দরী তুমি শুকতারা' চলতে পারে না?"

"ও, নিশ্চয়।" নীরেন সোম বলে: "কী জানো? I wish to associate poetry with getting slightly drunk."

গীতা আসে। চায়ের ট্রে হাতে ঝি তার পেছনে।

প্রিয়তোষ হেসে বলে: "যাক্, এখন একটু অন্য ধরনের ড্রাঙ্ক হতে পারবেন।"

পট থেকে সোনালি চা ঢালে গীতা। সরোজ বলে: "নীরেনদা, আপনার গোল্ড ঢালা হচ্ছে!"

প্রিয়তোষ গীতার খোসামোদে লেগে যায়ঃ "আগেকার দিনে মেয়েরা যে রান্না করে খাওয়াতে ভালোবাসতেন, তার ধ্বংসাবশেষ রয়ে গেছে আপনার চা করে খাওয়ানোতে!"

"অন্নের যখন আমাদের এমন ঘোর অনটন—" সরোজ যোগ দেয়ঃ "চা-ই ত আমাদের ষ্টেপল ফুড হয়ে দাঁড়াচ্ছে—কাজেই চা-তৈরীতেই পারদর্শিনী হচ্ছেন এঁরা!"

গীতা নীরেন সোমের দিকেই তাকায়ঃ "আপনার চিনি ত কম?"

"খুব কম। চা একটু তেতো না হলে কি ভালো লাগে?" নীরেন সোম বলেন।

হাতের প্যাকেটটা খুলে গীতা বলেঃ "আজ পটেটো-চীপস্, ডালমুট নয়।"

"তা-ই ত দেবে!" নিরঞ্জন ঠোঁটে একটা মিহি হাসি তৈরী করে বলেঃ "মুখ্যমন্ত্রী ত আমাদের আলু খেতেই বলেছেন!"

"কবিতা শুনতে চেয়েছিলে প্রিয়তোষ, শোনো—" সরোজ বলেঃ

"লেখা আছে কাগজে-আলু খেলে মগজে-ঘিলু যায় ভেস্তিয়ে বুদ্ধি গজায় না।"

"প্রজা নির্বোধ না হলে কি রাজার রাজত্ব চলে!" প্রিয়তোষ সবার আগে চায়ে চুমুক দিতে সুরু করে।

নীরেন সোম চায়ে চুমুক দিয়ে বলেনঃ "গুড!"

সরোজ বলেঃ "মিসেস ঘোস, শোনাবেন কি 'বনলতা সেন' কবিতাটা আমাদের?"

"সুকুমার রায়ের পর ওটা জমবে না।" সবার মুখে হাসির আলো বুলিয়ে নীরেন সোমের মুখে গিয়ে তা স্থির হয়।

"আমাদের এ সকালগুলো বেশ। নির্জন নয়, তবু নিরবিলি! মনে হয়, how far away are the unquiet lands!" তামাকে, চায়ে, গীতার হাসিতে আর কবিতায় নীরেন সোমের যেন সত্যি একটু নেশা লাগে।

কাজের দিনগুলোর ক্লান্তি এমন দিনেই মুছে যায় গীতার।

॥ চোদ্দ ॥

মনই বুঝি শরীরের অসুখ টেনে আনে। মনটা ভালো চলছিল না কয়েকদিন ভাস্বতীর। শেষে জ্বর হল। সুপ্রীতি বললেঃ "শরীরটা একটু ভালো হচ্ছিল তার মধ্যে জ্বরে পড়লে।" ম্লান হেসে ভাস্বতী বললে, "তোমার যন্ত্রণা বাড়ল পিকলুকে নিয়ে।" "আহা-হা, যন্ত্রণার ত আর সীমা নেই! তা-ই নিয়ে তুমি ভেবে ভেবে মরো।" সুপ্রীতি ভাস্বতীর হাতে হাত বুলোয়।

কাজ একটু বেড়েছে সত্যি সুপ্রীতির। পিকলুকে স্নান করানো, খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো। এসব কাজে ভীষণ খুঁতখুঁতে ছিল ভাস্বতী। কাজেই সুপ্রীতির ভাবনা থেকে যায় পিকলুর অসুবিধে হল কি না।

শমীনের খাওয়ার দেখাশোনাও সুপ্রীতি করতে যায়। শমীন বলে, "আপনি ভাস্কে দেখুন। আমাকে দেখতে হবে না। আমি নিজেকে দেখতে জানি।" কিন্তু সুপ্রীতি জানে খাওয়ার সময় সুপ্রীতি এসে কাছে দাঁড়ালে শমীন খুশী হয়। মাছ হয়ত নিতাই-এর হাত থেকে এক-টুকরোর বেশি শমীন কিছুতেই নিত না—কিন্তু সুপ্রীতি যতোটা নিতে বলে ততোটাই নেয় সে। এ-ও ভাস্বতীরই কাজ ছিল। শমীন হাসেঃ "ভাসের হয়ে আপনি কতোদিন প্রক্সি দিয়েছেন কলেজে?" "আমরা ত একসঙ্গে পড়িনি।" "পড়লে নিশ্চয়ই দিতেন।"

শরীর যখন একটু ভালোর দিকে, ভাস্বতী বলে, "আমি না থাকলেও এ সংসারের কোনো ক্ষতি হবে না—তুমি আছো।"

সুপ্রীতি চমকে ওঠে। বলেঃ "জ্বর সেরে গেলে পর তুমি প্রলাপ বকতে সুরু করলে?"

"এ জ্বর কি সারে?" বুঝিবা একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে ভাস্বতী।

একটু কালো হয়ে যায় সুপ্রীতি। কোথায় যেন একটু

যন্ত্রণা-ও অনুভব করে। ভাস্বতী যা বলছে তার যেন অন্য একটা মানে আছে, সুপ্রীতির মনে হয়।

মনস্কতায় ফিরে এসে বোগা হাসি হেসে ভাস্বতী আবার বলে, "এই রিউমেটিক ফিভার? বার বার হতে পারে। ডাক্তার যা বলেছেন আমি ত শুনেছি! হার্ট খারাপ হয়ে যায় এ জ্বরে। পিশিমার মতো আমিও ওঠা-নামা করতে পারব না।"

কথাগুলো একটু সহজ মনে হয় বলেই হাল্কা মেজাজ ফিরে আসে সুপ্রীতির। বলে, "ডাক্তারের কথা শুনছ? সুস্থ শরীর নিয়ে তাঁদের কাছে গেলে রোগ বার করে দেবে।"

"কিন্তু আমার শরীরটা সত্যি রোগের ডিপো।"

এটা ত তোমার আবিষ্কার?

ভাস্বতীর আবিষ্কার? না। শমীন নিশ্চয়ই তা-ই ভাবে। একটু কি নিরুৎসুক হয়ে পড়েনি শমীন ভাস্বতী সম্পর্কে? ভাস্বতী চুপচাপ তাকিয়ে থাকে সুপ্রীতির চোখে। যেন সেখানে কী পড়তে চায়। সুপ্রীতি তাকে আগেকার মতো ভালোবাসে কি না তা-ই যেন।

শমীন অফিস থেকে ফিরে এলেই সুপ্রীতি উঠে নিজের ঘরে চলে যায়। ভাস্বতীর কথাবার্তা তাকে যেন অসুস্থ, ক্লান্ত করে তোলে। হয়ত এ-ও একরকম সহানুভূতি। বিছানায় শুয়ে পড়ে। রম্য রচনায় চোখ বুলোতেও ইচ্ছে করে না।

রাত্রিতে খাবার টেবিলে শুধু শমীন আর সুপ্রীতি। ভাস্বতী যতোদিন থেকে অনুপস্থিত, সুপ্রীতি তাড়াতাড়ি খেয়ে চলে যায়। শমীনের সঙ্গে খেতে বসা যেন নিয়ম-রক্ষা শুধু। বলেছে সে, "কিছু মনে করবেন না, আমার খাওয়া যদি আগে শেষ হয়।"

শমীন তাকে উঠে যেতে অনুমতি দেয়নি, বলেছে, "আমি গল্প করে খেতে ভালোবাসি।"

তবু উঠে যেত সুপ্রীতি। বাধা দিত না শমীন। কিন্তু সেদিন বললে, "বসুন না। ভাসের শরীর আজ বেশ ভালো—মনটা হাল্কা লাগছে। গল্প করা যাবে খানিকক্ষণ।"

সুপ্রীতি বললেঃ "কি গল্প করবেন, ইতিহাসের? ইতিহাসের আমি কিচ্ছু জানি নে।"

"আপনার মনের ত একটা ইতিহাস আছে—তার গল্প বলুন।"

"আমি ত জার্নাল লিখিনে। মনেই রাখিনে মনের ইতিহাস।"

"তার মানে, মনকে তুচ্ছ করে যাচ্ছেন।"

"মন ত একটা অজ্ঞেয় ব্যাপার! তা নিয়ে মাথা ঘামায় কে বলুন? সাইকো-এনালিষ্ট ছাড়া?"

"আপনার মন-খারাপ হয় না কোনোদিন?"

"খুব কম। কেননা আমি ভাবিঃ সর্বঃ সর্বত্র নন্দতু।"

"বেশত! সবাইকে আনন্দিত দেখলে আপনার মন নিশ্চয় ভালো থাকে।"

"মন ভালো থাকার প্রথম সর্ত শরীর ভালো থাকা। ভাস্বতীকে দেখে তা বুঝছেন না?"

আর কী আশ্চর্য, তখুনি ভাস্বতী এসে দাঁড়াল খাবার ঘরের দরজায়। তাকে তারা আশা করেনি।

"এসো ভাস্বতী—" একটু থমকে থেকে সুপ্রীতি বললে, "তোমার নাম করতেই তুমি চলে এসেছ!"

"না, যাই—পিকলু এখনো ঘুমোয় নি। তোমাদের দেরী হচ্ছে আজ।" ভাস্বতী চলে গেল।

সুপ্রীতিও বসতে পারল না আর। খানিকটা অপরাধ-বোধেই যেন ছটফট করে উঠল।

ঘরে এসে ভাবলে সে. আমি কি ভাস্বতীকে আড়াল করে দাঁড়াচ্ছি। ভাস্বতী তা-ই ভাবছে? না, না। মন হাল্‌কা করতে চাইল সুপ্রীতি। কিন্তু তবু কতগুলো কথা উঠে এলো মন থেকে। ভাস্বতীর অসুখের দিনগুলোতে অনেক মুহূর্ত ত সে দিয়েছে শমীনকে, হয়ত সুখী হবার মতো কিছু কথাও। তা কি ভাস্বতীর উপর অন্যায় নয়? অন্যায় হলেও মুখ ফুটে কিছু বলবে না সে। তেমন মেয়েই নয়। শমীনের অন্যায়েও চোখ-মুখ বুঁজে থাকে সে।

তার দিদি ত বিবাহিত জীবনের উপরই ক্ষেপে গেছেন। বলেন, "জানিস সুপ্রীতি, এ একটা পশুর জীবন। ভালো করেছিস তুই, বিয়েতে যে রাজি হোসনি!" ভাস্বতী কি এ-জীবন বিনা দ্বিধায় মেনে নিতে পেরেছে? তার হাসিখুশী মুখের আড়ালে কি কোনো বিষণ্ণ মুখ নেই? তার রোগ-শয্যায় সে মুখটাই কি দ্যাখেনি সুপ্রীতি?

একটা যন্ত্রণা হল সুপ্রীতির। এই স্বামী-স্ত্রীর দুর্বোধ্য সম্পর্কের মধ্যে নিজের অস্তিত্বের যন্ত্রণা। তার অবস্থিতিতে এদের মনের ব্যবধান যদি বেড়ে গিয়ে থাকে, তার চাইতে দুঃখের আর কী আছে? আশেপাশের সবাইকে সে সুখী করতে চায়। 'সানি কটে' তেমি-ভাবেই দিনগুলো কাটিয়ে এসেছে সে। এখানে যেন তা পারছে না।

যা সে কোনোদিন ভাবে না তা ভেবে, মনে হল সুপ্রীতির, যেন দিনটার মুখই কালো করে দিল। তাড়াতাড়ি ঘর অন্ধকার করে বিছানায় শুয়ে পড়ল সে। চিন্তার ক্লান্তিতে ইথার-দেওয়া রোগীর মত নিঃসাড় হয়ে রইল।

দক্ষিণের হাওয়া দিচ্ছে। কলকাতার রাস্তায়, শড়কে, গলিতে, ঘুঁজিতে গঙ্গার স্রোতের মতো চলেছে এই হাওয়া! সাধে কি কল-কাতার রাস্তাগুলোকে তার কাছে রূপসী মনে হয়? আলো-হাওয়া মাখানো এক-একটি শিল্প যেন। কলকাতাকে সুপ্রীতি ভালোবাসে। ভীষণ ভালবাসে; সেই ভালোবাসাকে মনে এনে ঘুমিয়ে পড়তে চাইল সে।

একদিন চায়ের টেবিলে বলা শমীনের একটা কথা হাল্কা হাওয়ার মতোই ভেসে এলো। "আমার কী মনে হয় জানেন, মেয়েরা ভালোবাসা ছাড়া থাকতে পারে না।" সুপ্রীতি হেসে বলেছিল, "ঠিক তা-ই। আমিও একটা জিনিষ ভীষণ ভালোবাসি।—কলকাতা।"

॥ পনেরো ॥

নীরেন সোমের একটা মস্ত ছায়া পড়ছে গীতার উপর। বুঝতে পারে নিরঞ্জন। কিন্তু সে অসহায়। তার যেন সাহস নেই, জোরও নেই সেই ছায়া সরিয়ে দেবার। ছুটির আড্ডাগুলোতে সে কথা বলে, কিন্তু তাতে যেন মন থাকে না। মনে হয় যান্ত্রিক। যেদিন আর কেউ আসে না, শুধু নীরেন সোম ট্রাউজার-শার্ট-পাইপে আধবোজা চোখে অবধারিত ভাবে উপস্থিত হন, নিরঞ্জনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছে করে: কারণ সে জানে, নীরেম সোম ঘরে এলেই গীতা তাঁকে নিয়ে উঠে যাবে তাদের শোবার ঘরে। তার চোখের উপর অভিনীত হবে এই বিসদৃশ দৃশ্য! তার চাইতে তার বাইরে থাকাই ভালো। পনেরো-কুড়ি মিনিট পরে অবশ্যি তারা এ ঘরে আসে. নিরঞ্জনের দু'পাশে দু'জন বসে নিরীহ আলাপ করে, চা খায়, হাসে—কিন্তু নিরঞ্জনের মনে হয় সে যেন অনেক দূরে বসে আছে, যা বলতে হচ্ছে তা যেন জবরদস্তিতে।

ইংরেজী সাহিত্যের অ্যাংরি ইয়ং মেন নিয়ে গল্প করেন নীরেন সোম। তাঁরা যে তাঁদের অগ্রজ কবিদের উপর বীতশ্রদ্ধ সে কথা শোনান। গীতা বলে: "আমাদের এখানেও 'হাংরি ইয়ংমেন' হয়েছেন যাঁরা বলছেন এ-পর্যন্ত সাহিত্যের নাকি কোনো সমালোচনাই হয়নি! নীরেন সোম হাসেন: "তাঁরা হাংরি কেন? 'অ্যাংরি'র সঙ্গে অনুপ্রাশের খাতিরে?" গীতাও হেসে বলে: "ভীড়ের দরুণ।"

হাসতে পারে না নিরঞ্জন। হাসতে তার ইচ্ছা করে না।

কিন্তু তাতে নীরেন-গীতার আলাপ থেমে যায় না। নীরেন সোম বলে: "ট্রামে-বাসে ভীড়ের মতোই বুঝি এখন বাংলা কবিতার ভীড়।"

"তা-ই।" কথায় তারপর সুপ্রীতির ভঙ্গী আসে গীতার:

"বাসাংসি জীর্ণানি ত্যাগ করে আমি তাই পায়েই হাঁটি আর কবিতা না পড়ে গান শুনি।"

"ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রেভ্যুলেশান চলেছে আমাদের পঞ্চাশের পর থেকে কিন্তু সিটি সিভিলিজেশানের একজন কবি হল না, এলিঅটের মতো।"

নিরঞ্জন মুখ খোলে: "পনেরো বছরে তা হতে পারে না।"

নীরেন সোম বলেন: "কিন্তু এখনকার ছেলেমেয়েরা ত অনেক বেশি ইণ্টেলিজ্যাণ্ট!"

"ইণ্টেলেকচুয়্যাল নয়।" কথাটা বলতে পেরে যেন নিরঞ্জন খানিকটা খুশী হয়। খুশী হয় এই ভেবে যে গীতাকে সে বুঝি একটু আঘাত দিতে পারল।

গীতার ভুরু কুঁচকে ওঠে, বলে সে: "জীবনকে আমরা সহজভাবে নিতে জানি যা তোমরা, এ যুগের নও বলে, জানো না।"

"সে ত অতি পুরোনো বাঙালীর সহজিয়া বৃত্তি!" নিরঞ্জন মন্তব্য করে।

"ট্রাডিশান রাখা ত ভালো।" নীরেন সোম গীতাকে খুশী করতে চান।

খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে গীতা বলে: "ও, ভুলেই গেছি—চা নিয়ে আসছি আপনার জন্যে।"

গীতা উঠে চলে যায়। অনর্গল পাইপ টানতে থাকেন নীরেন সোম।

নিরঞ্জনের উপস্থিতিতে এম্নি নির্দোষ আলাপই হয়। কিন্তু এমনও দিন আছে, নিরঞ্জন হয়ত কলেজে, নীরেন সোমের অফ-ডে—গীতা স্কুল-কামাই করে। দুপুরবেলাটা নীরেন আর গীতা ঘনিষ্ঠ উষ্ণ আলাপে কাটিয়ে দেয়। গীতার মনে হয়, এ দিনগুলো যেন তার নিরঞ্জনের সঙ্গে প্রথম আলাপ হবার দিনগুলোর মতো। না। তার চাইতেও বেশি। বেশি আশায় ভরা। আশার রামধনু রঙে রঙীন।

"প্রেম সম্পর্কে তোমার কি ধারণা, গীতা?" নীরেন সোম হয়ত জিজ্ঞেস করেন।

পুরুষরা প্রেমে পড়লে সংজ্ঞা নিয়ে বিশ্লেষণ করে। গীতা জানে। নিরঞ্জনও তা-ই করত। নিরঞ্জন তাকে বুঝিয়েছিল, প্রেম 'সিলেক্টিভ সেক্সুয়েষ্ট্রলটি' ছাড়া কিছু নয়। "আমরা সবার শরীর কামনা করিনে, একেক জনের করি—তা-ই প্রেম।" বলত সে। সে-কথা বলে না গীতা। বলেঃ "সঙ্গ কামনা করাই প্রেম।"

"আমার সঙ্গ তোমার কাছে বোরিং মনে হয় না ত ?"

"কেন মনে হবে ? আপনি ত ইংরেজি সাহিত্যের প্রেমে আছেন, আমিও বাংলা-সাহিত্য ভালোবাসি।"

"তাই হয়ত আমাদের দুটো মন প্যারালাল চলেছে। ইটারনিটিতে গিয়ে মিট্ করবে।"

"আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করব ? আপনি বিয়ে করেন নি কেন ? আপনার জীবনে কি কোন মেয়ে আসেনি ?"

"ঢের।" হাসেন নীরেন সোম, তারপর আগেকার কথাতেই যেন যোগ করে দেনঃ

"There will be time, there will be time
To prepare a face to meet the faces that you meet"

"সে সময় বুঝি ইটারনিটি।"

"হতে পারে। আমি ভারতীয়। মৃত্যুর পরও জীবন মানি। কে জানে, যখন তুমি আমি কেউ থাকব না তখন হয়ত এঘরেই আমাদের ছায়া এম্নি ভাবে এসে বসবে ! When we die our shades will rove !"

"এমন ত অনেকেরই বিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথের 'যেদিন পড়বে না আর পায়ের চিহ্ন'—গানেও এ-বিশ্বাস আছে।"

"রবীন্দ্রনাথের চাইতে বড়ো ভারতীয় আর কেউ নেই।"

হয়ত তারপর আর অনেকক্ষণ কোন কথা হয় না। তখন পাইপে তামাক ভরে আগুন ধরান নীরেন সোম, আর গীতা হাসিমুখে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। তখন নীরেন সোমকে একটু নিরাসক্ত, একটু নির্বিকার মনে হয়।

গীতা বলবার সুযোগ পায়ঃ "আপনি অনেক মেয়ের সঙ্গে মিশেছেন বলছেন, কিন্তু কেউ বোধহয় আপনার মনের গভীরে যেতে পারে নি।"

"Perhaps I am a bit of a womaniser !" হেসে ওঠেন নীরেন সোম।

কিন্তু তাতেও গীতা চমকে ওঠে না, ভয় পায় না। বরং ভাবে, নীরেন সোমের সঙ্গে তার এই মুহূর্তগুলো দুর্লভ। তাই বলে যে গীতা নিরঞ্জন থেকে দূরে সরে গেছে তা নয়। নিরঞ্জনকেও সে সমান উষ্ণতায় পেতে চায়। কলেজ থেকে এলে এক সঙ্গে চায়ে বসে। এটাওটা জিজ্ঞেস করে। হয়ত বলেঃ "ফ্রাইড রাইস্ খেতে ত তুমি ভালোবাসতে। রাঁধবো? খাবে?" আগ্রহ দেখায় না নিরঞ্জনঃ "না, থাক্। কেন মিছিমিছি পরিশ্রম করা?" "ও আবার পরিশ্রম নাকি? সুষমাদি কতো কাজের মধ্যেও মাঝে মাঝে আমাদের রান্না করে খাওয়াতেন।" গীতা আগেকার দিনগুলোকে মনের উপর নিয়ে আসে। নিরঞ্জনের সঙ্গে প্রথম মেলামেশা করার দিনগুলো। তা-ও যেন দুর্লভ মনে হয় এখন।

চায়ের শেষে নিরঞ্জন বই নিয়ে বসেঃ জর্জ অরওয়েলের বা লরেন্স ডুরেলের সাহিত্য-সমালোচনা। গীতা রান্নায় চলে যায়। কিন্তু বারবারই নিরঞ্জনের কাছে এসে দাঁড়ায় কোনো কথা শোনবার জন্যে বা বলবার জন্যে। বলেওঃ "একদিন ভাস্বতীর বাড়ি যেতে হবে, বুঝলে?"

"কেন?" বই থেকে মুখ না তুলেই বলে নিরঞ্জন।

"সুপ্রীতি বললে, ওর খুব অসুখ গেছে। দেখতে যাওয়া উচিত।"

"হুঁ।" ওইটুকুই কথা নিরঞ্জনের।

রান্নাঘরে বসে ভাবে গীতা, নিরঞ্জনের কি এই মিথ্যা ধারণা হয়েছে, আমি ওকে ভালবাসিনে?

॥ ষোল ॥

'সানি কটে'র চেহারাটাই পাল্টে গেছে। যেন একটা লাইব্রেরী। সুলেখা দত্তের ঘরে যাও, এজ্রা পাউণ্ড-এলিঅট-ডি এইচ লরেন্সের বই-এর ছড়াছড়ি দেখবে। সুষমাদির ঘরে কৃষ্ণা শুধু নোট লিখেই চলেছে। এক তৃপ্তি আর লতিকার ঘর। সেখানেই যা-কিছু বাজে কথা হয়। কিন্তু সুপ্রীতি নেই, তাই হাসি নেই। গীতা নেই, গান নেই।

লতিকা বলে: "সানি কট একটা নানারি হয়ে উঠল, তৃপ্তিদি—আমার মোটেও ভাল লাগছে না।"

"আমি তোমাকে এতো ভালবাসি—" তৃপ্তি হাসে: "তাতেও তোমার মন ওঠে না? পুরুষের ভালবাসা চাই?"

লতিকার চোখের স্বপ্ন তেম্নি একটি শ্বশুরের ঘর, যেখানে শ্বশুর তাকে বাবার মতো আদর করবেন, শাশুড়ি হবেন মার মতো। তবে যদি তার বাবা-মাকে হারানোর দুঃখ যায়। এম্নি সামাজিক বিয়েই সে চায়। গীতাদির মতো শুধু স্বামিকে চায় না। অবশ্য প্রথম দেখায় নিরঞ্জনকে তার ভালোই লেগেছিল। তাই তৃপ্তিকে বলে: "চলোনা গীতাদির বাড়িতে—ছুটির দিনে। সেখানে নাকি সুন্দর-সুন্দর আলাপ-আলোচনা হয়। প্রফেসাররা আসেন।"

"তোমার দাদার বাড়িতে জমেনা?—তোমার মেজদা ত প্রফেসার মানুষ! চলে যাও সেখানে।"

"মেজদাকে লিখেছি, ওখানে একটা কাজ পেলে যাবোনা ভাবছ?"

"লোক চায় কলকাতা আসতে আর তুমি চাও মেদিনীপুর যেতে?"

"এখানে, এই স্কুলে আমার কি ভবিষ্যৎ?"

"কলকাতা এমন একটি বর্তমান যে সব রকম ভবিষ্যতের দরজাই এখানে খোলা। ভাস্বতীর মতো ভবিষ্যৎ চাও ত ঘটক-অফিসে চিঠি দাও আর গীতার ভবিষ্যৎ চাও যদি ফাংশান-টাংশানে যেতে সুরু করো।"

"যে ভবিষ্যৎই চাই, সুষমাদির মতো ওল্ড-মেড হয়ে থাকতে চাইনে, তা ঠিক।"

"অতি ঘরন্তী না পায় ঘর।"

"তুমি ত তা নও। তুমি ঘর পেলেই আমি খুশী হব।"

"আমেরিকান মেয়েরা বিয়ে করে বলে, বড্ডো 'ডাল্' জীবন—বিয়ে না করে তোমার তা-ই হয়েছে। রোববার-রোববার সিনেমায় চলো আমার সঙ্গে—দেখবে দিনগুলো কেমন যাচ্ছে!"

"তুমি ত তোমার আদর্শ দেখতে যাও—তাই ভালো লাগে।"

"বরং উল্টো। আমি সিনেমার মেয়েদের আদর্শ হতে চাই। প্রত্যেক ছবিতে এই একটা পোজ দেখবে, নায়কের বুকে মুখ রেখে নায়িকা হাবার মতো তাকিয়ে আছে। রিভোল্টিং!"

"তাহলে কী দেখতে যাও তুমি সিনেমায়!"

"এমন একটি মেয়ে-চরিত্র তৈরী হল কিনা যার ব্যক্তিত্ব আছে।"

"টীচারির বিষে তোমাকে ধরেচে তৃপ্তিদি, ব্যক্তিত্বের উপর ঝোঁক দিতে শিখেছ!"

"টীচারদের ব্যক্তিত্ব আর কতোটুকু? আমি জীবনে একটি মাত্র মেয়ে দেখেছি, যিনি টীচার নন, যাঁর ব্যক্তিত্ব অদ্ভুত! হাজার লোকের মাঝখানেও যদি তিনি দাঁড়িয়ে থাকেন, তোমার চোখ তাঁর উপর পড়বেই।"

"কার কথা বলছ?"

"মা আনন্দময়ীর নাম শুনেছ? তিনি।"

লতিকা টিপ-টিপ হাসে: "তুমি সাধু-সন্নেসীই হবে দেখছি!"

"আমি আর কিছু হব না। যা হবার হয়ে গেছি।"

"কিছুদিন আগেও চুপচাপ বসে থাকতে। মন্ত্র-টন্ত্র জপাতে নিশ্চয়।"

"সিদ্ধি বুঝি হয়ে গেছে, তাই এখন আর জপিনে?"

"কী জানি কী করো! কার চরিত্র কে জানে বলো!"

"যা করব, তুমি অন্ততঃ জানতে পারবে।" তৃপ্তিও হাসতে সুরু করে।

কামিনী চা নিয়ে আসে।

লতিকা বলে: "এতোক্ষণে দয়া হল মিনি তোমার? স্কুল থেকে এসে আধ ঘণ্টার উপর বকবক করছি, তবু তোমার চা-ই হয় না!"

"কী করব বলো! মেজোদিদিমণির জন্যে খাবার এনে দিতে হল!" কামিনী কৈফিয়ৎ দিয়েই চলে যায়।

"এখন ত সুলেখাদিরই 'সানি কর্ট'—" তৃপ্তি বলে: "তা জানোনা? আমাদের উপর আর সুষমাদির বিশ্বাস নেই—কখন থাকি না-থাকি।"

"দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আমরা যারা জন্মেছি—" লতিকা বলে: "তাদের নিজেদেরই কোন বিশ্বাস নেই। তাদের বিশ্বাস করবে কে?"

চায়ে চুমুক দিয়ে দিয়ে কথা হয়। এক কাপ চায়ে অন্তত আধ ঘণ্টা সময় যায়। কী করবে ওরা? এ সময়টা কিছুতেই কাটানো যায় না।

"গীতাদি কেমন আছে—তোমার কি মনে হয় তৃপ্তিদি?" লতিকা জিজ্ঞেস করে।

"সুখী হতে চেষ্টা করছে বোধহয়—একদিন বলেছিল আমাকে: 'বিয়ের কাছে বেশী-কিছু প্রত্যাশা করতে নেই, তবেই সুখী হওয়া যায়।'

"ওসব বিয়েতে এম্নি হয়।"

"কী হয়?"

"মন ভরে না।"

"বাবা-মা একটি বর জুটিয়ে আনলেই মনের পেয়ালা ভরে ওঠে?"

কী করে জানবে লতিকা? তার নিজের কোনো ধারণা নেই। প্রচলিত ধ্যান-ধারণাগুলো ধরেই সে চলতে চায়। ভাবে, যা অনেক-দিনের আঘাতেও ভাঙেনি তাতেই বুঝি সত্য আছে, আছে শান্তি। জীবনের কতোটুকুই বা দেখেছে সে? দেখতে চায় বা কতোটুকু! যখন যা ভালো লাগে করতে ইচ্ছে করে। কখনো সাজে। হাতে পয়সা জমলে রঙীন শাড়ী কেনে। ফুটবল খেলা দেখতে ভীষণ ইচ্ছে। মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গলের ধ্রুপদী রেষারেষির খেলা। কিন্তু তৃপ্তিদি ত যাবেন না, মানে তার সঙ্গে। তাই যাওয়া হয় না, দেখা হয় না। কিন্তু খবরের কাগজের খেলার পৃষ্ঠাটা সে মুখস্থ করে ফেলে। মৌলিকের মাটিঘেঁষা শট্ যে কি মারাত্মক লতিকা তা পড়েই চোখের উপর যেন ছবিটা দেখতে পায়। তাছাড়া গান-বাজনা শুনতে ভালো লাগে তার। এসব ভালো লাগা মিলেমিশে যা, তাছাড়া যে জীবন অন্য কিছু সে ধারণা লতিকার নেই। যেদিন সে সাজতে পারে, সেদিনটা সুন্দর। যেদিন ইষ্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের খেলা থাকে, সেদিনটা উত্তেজনাময়। যেদিন কোন জলসায় যাবে, সেদিনটা যেন নেশায় ভরা। আজকের মতো রঙ-ছুট দিনেও সেসব রঙীন দিনের কথাই ভাবে লতিকা।

তৃপ্তি লতিকাকে চুপচাপ দেখে অন্য কথায় যায়:

"কৃষ্ণা যেমন পড়াশুনা লাগিয়েছে আমার ভয় হয় ও না ফার্ষ্টক্লাশ পেয়ে যায়।"

"তাতে ভয় কেন তোমার?" লতিকা জিজ্ঞেস করে।

"ফার্ষ্টক্লাশ হলেই ত প্রফেসর হয়ে যাবে!"

"হলোই বা।"

"প্রফেসাররা যে টিচারদের কৃপার চোখে দেখেন, তা বুঝি জানো না?"

"মোটেও না। সুলেখাদি আমাদের রীতিমতো ভালোবাসেন।" ঠাণ্ডা চা-তে চুমুক দেয় লতিকা অনেকক্ষণ পর।

। সতেরো ॥

এক সন্ধ্যায় নিরঞ্জন আর গীতা ভাস্বতীকে দেখতে এলো। পিকলু দেয়ালে বল ছুঁড়ছিল, বসে বসে তা-ই দেখছিল ভাস্বতী। দু'জন অপ্রত্যাশিত অতিথিকে দেখে খুশীতে সে ফেটে পড়লোঃ "এসো! বাঃ, কী সৌভাগ্য আমার!"

ঘরের দুটো চেয়ারে ওরা দুজন বসল। গীতা বললেঃ "সুপ্রীতির মুখে শুনেছিলাম তোমার অসুখ। ভালো হয়ে গেছ পর দেখতে এলাম। কী করব, সময়ই পাইনে। ঝির সঙ্গে-সঙ্গে কাজ করতে হয়, নইলে চলেনা।"

ভাস্বতী হেসে বলে নিরঞ্জনকেঃ "গীতাকে বুঝি খুব খাটিয়ে মারছেন?"

"লো-ইনকাম গ্রুপের উপায় কী বলুন? ঘরের কাজকর্ম নিজের হাতেই করতে হয়, আমি কি হাটবাজার কারনে?" নিরঞ্জন বলে।

হাত বাড়িয়ে পিকলুকে কাছে টেনে এনে ভাস্বতী বলেঃ "পিকলু, এই আরেকটা মাসী—গীতা মাসী।"

"তুমি পিকলু, আমি গীটার—বুঝলে?" পিকলুর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় গীতা। তারপর বলেঃ "সুপ্রীতি কোথায় ভাস্বতী?"

"ওঁর সঙ্গে নিউ-মার্কেটে গেছে। কিছু কেনাকাটা আছে। আমি ত হার্টের জন্যে কোথাও বেরোতে পারিনে।"

"সত্যি, ভীষণ রোগা হয়ে গেছেন আপনি!" নিরঞ্জন বলে।

"আমার ত রোগ!" ভাস্বতী হাসে।

নিরঞ্জনের মনে হয়, ভাস্বতীও বুঝিবা তারই মতো একটা যন্ত্রণা চেপে রাখছে।

গীতা পিকলুকে বলেঃ "এসো পিকলু, সুপ্রীতিমাসীর ঘর দেখাবে আমায়—তারপর রান্নাঘর।"

"প্রিটি আমার জন্যে ফ্যারাজিনির কেক আনবে।" পিকলু বলে

"তোমার ত সারাদিনই খাই-খাই!" ভাস্বতী পিকলুকে ছেড়ে দেয়ঃ "এখন নিতাইকে বলো ত চা করতে।"

পিকলু চেঁচিয়ে উঠলঃ "নিতাই, গীটারের জন্যে চা করো।"

"চলো চলো—তোমাদের বাড়ি দেখাবেনা আমায়?" পিকলুকে টেনে নিয়ে গীতা চলে যায়।

চুপচাপ বসে থাকে নিরঞ্জন। রোগিণীকে কথা বলানো অন্যায়। কিন্তু ভাস্বতী নিজে থেকেই কথা বলেঃ "আপনাকে বিমর্ষ দেখাচ্ছে কী হয়েছে আপনার?"

"আজকাল কি কেউ সুখী হতে পারে? পারে না। কি বলেন?" একটা নিঝুম হাসিতে নিরঞ্জন তাকিয়ে থাকে ভাস্বতীর মুখে।

"একটু অসুখী হওয়া ত শিল্পীর লক্ষণ।"

"আপনি কি সুখী?"

হেসেই বলে ভাস্বতীঃ "নিজের বাইরে কি কোথাও সুখ আছে? আমরা বলি, সুখের দিন। যেন দিনটা সুখ নিয়ে আসে। কী ভুল ভাবনাই না আমাদের! ভুলে যাই, সুখ যে সবটুকুই মনের ভেতর থাকে। সুখী মন দিয়েই আমরা দিনের মুখ রাঙিয়ে দিই।"

"সুখী মন! সে-মন আমার নষ্ট হয়ে গেছে।"

"মন ত নষ্টই হয়। ছেলেবেলাকার মন, যা দিয়ে প্রত্যেকটি দিন রঙীন করে তোলা যেতো, তা কি চিরদিন কারো থাকে?"

নিরঞ্জন যেন একজন সহৃদয় শ্রোতা পায় যার কাছে হৃদয় খুলে ধরতে কোনো বাধা কোনো সঙ্কোচই নেই। মনের যন্ত্রণাকে ভাষা দিতে চেষ্টা করে সেঃ "নিজেকে দিয়ে অন্য কাউকে বা অন্য কিছুকে সার্থক করে তোলা—তা-ই ত জীবনের কাজ—জীবন। তা-ই যদি না হলো, আর নষ্ট মন নিয়ে তা হয়ও না, তবে আর জীবনের কী মানে আছে?"

'জীবনের কী মানে আছে?'—কথাটা এসে যেন বেঁধে ভাস্বতীকে। সত্যি, কি মানে আছে আর তার জীবনের। শর্মীনের কাছে সে

ফুরিয়ে গেছে! সে নিশ্চিত জানে। সুপ্রীতিকে তার সঙ্গে নেবার জন্যে আজ কতো অনুরোধ! শমীনের জীবনে সুপ্রীতির দরকার আছে, তার দরকার নেই। তাতে যে তার ভয়, রাগ, ঈর্ষা হচ্ছে তা নয়। শুধু এই দুঃখ, নিজেকে সে সার্থক করতে পারল না।

কিন্তু নিজেকে উচ্চারিত করল না ভাস্বতী। স্থির থাকবার সুস্থতা তার মনের আছে। অন্যমনস্কের মতো বললে সে: 'জীবনের মানে আর কতোদিন থাকে, বলুন?"

নিরঞ্জনের ইচ্ছে করে ভাস্বতীর আরো কাছে বসে আরো খানিকক্ষণ কথা বলে।

কিন্তু পিকলুকে নিয়ে গীতা ফিরে আসে। বলে: "ভাস্বতী, তোমার নিতাই ত ভারি স্মার্ট দেখছি। এক ঝুড়ি ফল কেটেছে আমাদের খাওয়াবে বলে'। নিশ্চয়ই ওসব তোমার পথ্য!"

"ফল খাবে না, শুধু চা খাবে না কি?" ভাস্বতী উঠে যায় নিতাই-এর ব্যবস্থা দেখবার জন্যে।

পিকলু বলে: "গীটার, তুমি মীটিং করো না?"

মীটিং? গীতা আর নিরঞ্জন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। এবং আরো খানিকটা গম্ভীর হয়ে যায় নিরঞ্জন।

"মীটিং—মীটিং—" চেঁচিয়ে ওঠে পিকলু।

"হেঁ, হেঁ—বুঝেছি—" গীতা বলে: "মীটিং দেখতে যাও না কি তুমি?"

"প্রিটি মীটিং করে।"

"আমিও করি। আমার বাড়ি যেও। যাবে ত?"

ফলের প্লেট নিজ হাতে নিয়ে আসে ভাস্বতী—আনারস, পেঁপে, তরমুজ। চা-বিস্কুটের ট্রে নিয়ে নিতাই তার পিছনে।

"এ কী!" নিরঞ্জন বলে: "অসুস্থ শরীর নিয়ে আপনি আমাদের পরিচর্যায় লেগে গেলেন!"

"অসুখ ত সেরে গেছে!" ভাস্বতী হাসে: "যা আছে তা আর সারবে না।"

॥ আঠারো ॥

তারপর আরেক দিন। সুপ্রীতি কিছুতেই রাজি হতে চায়নি। ঘরে গিয়ে পুরনো বইগুলো নাড়াচাড়া করতে সুরু করেছে। কিন্তু শমীন নাছোড়। সুপ্রীতির ঘরে গিয়ে বলেছে: "ভাস্কে বেরোতে ত ডাক্তার এখনো অ্যাডভাইস করছেন না। তাই আপনাকে বলছি আপনি ত লোককে আনন্দ দিতে চান। আমার সঙ্গে বেড়াতে গেলে আমি কী খুশী হব, জানেন?"

কেমন একটা লজ্জায়ই বুঝি কানের দু'পাশটা গরম হয়ে ওঠে সুপ্রীতির। বলে: "ভাস্বতী কী ভাববে বলুন ত? সেদিন মার্কেট থেকে আসতেই ও বললে 'এতো দেরি করলে! গীতা তোমার অপেক্ষায় অনেকক্ষণ বসেছিল!' "সত্যি, আমার যাওয়া উচিত হয়নি।"

"রোজই ত গীতা এসে বসে থাকবে না! চলুন। দূরে নয় আর দেরিও হবে না।" শমীনের গলায় কোনো দ্বিধা নেই।

সুপ্রীতি পোস্ট-অফিসের বা এ-জি-বেঙ্গলের মেয়ে নয় যে কারো অনুরোধের উপর স্পষ্ট 'না' বলে দেবে। বই ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো সে। বললে: "কোথায় যাবেন? এ-শাড়িতেই যাওয়া চলবে ত?"

"সব শাড়িতেই ত আপনাকে বেশ মানায়!" খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে শমীনের চোখ।

পায়ে চপ্পল গলিয়ে সুপ্রীতি বলে: "চলুন।"

সুপ্রীতি শুনল, ভাস্বতীকে পিকলু ছড়া শোনাচ্ছে:

"বাবা যদি রামের মতো পাঠায় আমায় বনে
যেতে আমি পারিনে কি তুমি ভাবছ মনে?..."

ভাস্বতীকে বলে যেতে ও ঘরে গেল না আর সুপ্রীতি—বরাবর সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল। যেন পেছনে শমীনের উপরই ভার দিয়ে এলো সে সব-কিছু বলবার। শমীন একটু পরে নেমে এলো সুপ্রীতি ভেবে নিলে, ভাস্বতীকে সে জানিয়ে এসেছে বেড়াবার খবর।

বেশি দূর নয়। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল। পথে কোনো কথাই বললে না সুপ্রীতি। মেমোরিয়্যালের কাছাকাছি এসে শমীন সুপ্রীতির গা-ঘেঁষা হয়ে বললেঃ "হাঁটতে ভালো লাগলো না তোমার?" এই প্রথম শমীন সুপ্রীতিকে তুমি বলছে।

একটু আলগা হয়ে সুপ্রীতি বললে: "আমাকে বলছেন?"

"ভাস্‌কে বলছিনে নিশ্চয়ই। তোমাকেই।"

সুপ্রীতি চুপচাপ পাশাপাশি হেঁটে চলল।

একটা আধো-অন্ধকার জায়গা খুঁজে বসল শমীন। সুপ্রীতি জিজ্ঞেস করল: "হাঁটবেন না?"

"একটু বোসো। হাঁটলে পথ ফুরিয়ে যেতে কতোক্ষণ?"

বেশ খানিকটা ব্যবধান রেখে বসল সুপ্রীতি।

কথায় ঘনিষ্ঠ হতে চাইল শমীন: "এ সব স্মৃতিসৌধে বেড়াতে আসার মানে কি জানো, বেড়ানোটাও স্মৃতিতে থেকে যায়।"

"বেশ, থাক স্মৃতিতে। তাহলে বলুন, এ-বেড়ানোটাই প্রথম আর শেষ।" চৌরঙ্গীতে যে মোটরের আলো ছোটাছুটি করছে তার দিকে তাকিয়ে থাকে সুপ্রীতি।

"যদি আজকের দিনটা ভালো লাগে—আর তা মনে পড়ে কোনোদিন—মনে পড়ে আবার বেড়াবার ইচ্ছে হয়?"

"আমার?"

"আমার ত হবেই। তোমার হতে পারে না?"

"না।"

"কেন?"

"আমার মনে হচ্ছে আপনি ভাস্বতীর উপর অন্যায় করছেন, আমিও।"

"কেউ অন্যায় করছিনে। জীবন ওর উপর সদয় নয়।"

সুপ্রীতি ভাবে, নিজের মনকে চমৎকার পরিষ্কার করে নিয়েছে শমীন। কিন্তু সে কি তা পারে? ভাস্বতী অসুস্থ বলে সে-ও কি অসুস্থ নয় মনে-মনে?

শমীন সুপ্রীতির গা-ঘেঁষা হয়ে বসে। বলেঃ "কেন বাজে কথা ভেবে একটি সুন্দর সন্ধ্যা নষ্ট করছ?"

"ভাস্বতী আমার বন্ধু। তা ভুলে যাবেন না।" যেন একটু রুক্ষই শোনায় সুপ্রীতির কথাটা।

"আমাকে তুমি হয়ত ভুল ভাবছ—" শমীন পিছিয়ে যায় না, বরং সুপ্রীতির একটা হাত নিজের হাতে তুলে নেয়ঃ "ভাস আমার কাছে কোনো দুঃখ পায়নি।"

কথা বলার অভ্যাস সুপ্রীতির কিন্তু আজ যেন তার সমস্ত কথা ফুরিয়ে গেছে। ভাস্বতীর যন্ত্রণা, শমীনের যন্ত্রণা, তার নিজের যন্ত্রণা যেন বোবা করে দিল তাকে। এমন কি হাতটাও ছাড়িয়ে আনতে পারল না সে। তাতে যেন যন্ত্রণা বেড়ে যাবে।

শমীনের মনে হচ্ছিল, ভাস্বতীকে প্রথম ছোঁওয়ার স্বাদ যেন সে আজ আবার ফিরে পেল। 'তোমার উপর আমি কোন অন্যায়ই করিনি, ভাস। এখনো তোমাকে মনে-মনে ভাবছি—' নিজেকেই শোনাল শমীন।

কয়েক মুহূর্ত ওরা চুপচাপ। তারপর হঠাৎ হাত সরিয়ে নিয়ে সুপ্রীতি জিজ্ঞেস করলঃ "ক'টা বাজে?"

হাত-ঘড়ি না দেখেই শমীন বললেঃ "দশ মিনিটও হয়নি আমরা এখানে এসেছি।"

"আরো ক'মিনিট থাকবেন?"

"সামনে এমন খোলা ময়দান—তোমার ভালো লাগছে না জায়গাটা?"

"পিকলুকে নিয়ে এলে হত না?—খোলা ময়দানে ছোটাছুটি করত!"

সুপ্রীতি ভাবছিল, পিকলু সঙ্গে থাকলে, কয়েক মুহূর্ত আগের ঘনিষ্ঠতাটা হতে পারত না। তাতে যেন তার সম্ভ্রম বেঁচে যেতো। তার মনে হল, শমীনের একটা অন্যায় ইচ্ছার কাছে সে নিজেকে সমর্পণ করেছে। অত্যন্ত সাধারণ মেয়ের মতো। তার এতোদিনকার আচার-আচরণের সীমা লঙ্ঘন করে গেছে সে।

শমীন খানিকক্ষণ চুপ থেকে বললে: "তার মানে তোমার ভালো লাগছে না এই বেড়ানোটা?"

"সন্ধ্যায় ত আমি বেড়াইনে কোনোদিন—আজ তাই কেমন অদ্ভুত লাগছে।"

"তাহলে চলো।" শমীন উঠে দাঁড়াল।

সুপ্রীতিও সঙ্গে-সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেল।

পথে শমীন দু'একটা কথা বলল, সুপ্রীতি একটাও না। শমীনের সব কথায় সে কানও দিল কিনা সন্দেহ। একটা কথা শুনল: "আমি বলি বটে আনন্দই জীবন। কিন্তু কেউ আমার জীবনে আনন্দ এনে দিল না।" কেউ আর কে—সুপ্রীতি ভাবলে—ভাস্বতী। আমিও কি? শিউরে উঠল সে। আমার কাছে তোমার কোনো প্রত্যাশা নেই, কোনো প্রশ্রয় নেই।

বাড়ি ফিরে এসে ওরা নিতাই-এর কাছে শুনল, দিদিমণি এই মাত্র বেরিয়ে গেলেন।

"পিকলু?" জিজ্ঞেস করল শমীন।

"উপরে মা-ঠাকরুণের কাছে রেখে বেরিয়ে গেলেন!"

"তোমায় বলে যাননি, কোথায়?" সুপ্রীতি বললে।

"না।"

ভালোই হল, ভাবলে সুপ্রীতি, এখুনি যে ভাস্বতীকে তার মুখ দেখাতে হচ্ছে না। তার মনে হ'ল, ভাস্বতীর এই বেরিয়ে যাওয়াতে

আরো মনে হল, ভাস্বতীর কাছে সে একটা গুরু অপরাধ করে এসেছে।

"হয়ত মার্কেটে গেছে। কেনাকাটির সখ ত ওর খুব। একটা ট্রে-শিট কিনবে বলেছিল।" ব্যাপারটা হাল্কা করে দিয়ে শমীন তার ঘরে চলে যায়। ভাবে, পিশিমাকে জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে কোথায় গেছে ভাস।

ঘরে ঢুকেই সুপ্রীতি বিমর্ষ হয়ে গেল, যেমনটা সে আর কোনোদিন হয়নি। তার জীবনের সব চাইতে বড়ো ঘটনা বুঝি আজকেই ঘটে গেল। অপ্রত্যাশিত বলেই বড়ো। তেমন বড়ো বুঝি হয়ে উঠত না, ভাস্বতী যদি বাড়ি থাকতো। উঁচু গলায় নিজেকে শোনাবার স্বভাব নয় ভাস্বতীর, নিজেকে যথেষ্ট সংযত করে রাখতে পারে সে। কিন্তু আজ যেন আর পারল না। প্রতিবাদ। প্রতিবাদ ছাড়া এ আর কী! তার আর শমীনের আচরণের প্রতিবাদ। যার বিছানায় শুয়ে থাকবার কথা, ডাক্তারের নিষেধ, শরীরের অক্ষমতা সব তুচ্ছ করে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল!

কোথায় যেতে পারে ভাস্বতী? মার্কেটে নিশ্চয়ই নয়। 'সানিকটে?' সুষমাদিকে ব্যাপারটা জানাতে? না-না। ভাস্বতী তেমন মেয়ে নয়। দরজা বন্ধ করে হয়ত সে কাঁদবে। কারো কাছে বসে চোখের জল ফেলবে না। তাহলে ত পিশিমাই ছিলেন। সুষমাদি কেন?

কোথাও বসতে পারল না সুপ্রীতি, দাঁড়াতেও না। ঘরময় ঘুর-ঘুর করতে লাগল! মনে-মনে বললে: যে নাটকের সুরু হয়েছে ভাস্বতীর অসুখের সময় থেকে, আজই তার যবনিকা পাত হয়ে যাক। আর যা-ই করুক সুপ্রীতি, ভাস্বতীকে দুঃখ দিতে পারে না, তার মনে কোনো-রকম ঈর্ষা জাগাতে পারে না।

॥ উনিশ ॥

পিকলুকে নিয়ে অন্যমনস্ক থাকলেও ভাস্বতী শমীনের জুতোর শব্দ শুনতে পেয়েছিল বাইরে, সিঁড়ি দিয়ে সে শব্দ নেমে গেল, তা-ও শুনল। বেড়াতে বেরোল শমীন। দিল্লীর অভ্যাস। ভাস্বতীও থাকত সঙ্গে—কোনোদিন লাল-কেল্লা, কোনোদিন জুমা মসজিদ কোনোদিন ফিরোজশা' কোটলা। দূরে যাবার সময় থাকলে কুতুব, তা না হলে নিউদিল্লীর কালিবাড়ি। এখানে এসেও ত গঙ্গার ধারে, ময়দানে, লেকে গেছে। কেমন যেন মন-খারাপ হয়ে গেল ভাস্বতীর। ডাক্তার ত বলেছিলেন, হার্ট ভালো রাখতে হলে কিছু-কিছু শারীরিক পরিশ্রম দরকার। আজ কি শমীন নিয়ে যেতে পারত না তাকে ?

সুপ্রীতির ঘরে গেল সে গল্প করে মন ভালো করতে। সুপ্রীতি নেই। সুপ্রীতি তবে শমীনের সঙ্গে গেল ? ভাস্বতীকে ত বলেও গেল না! বললে সে কি বাধা দিত শমীনই কি বলতে দেয়নি ? তাই হবে। এ ত তার কাছে অনেকদিন আগেই স্পষ্ট হয়ে গেছে যে শমীন তাকে নিয়ে সুখী হতে পারছে না। অসুস্থ রোগীকে নিয়ে কে সুখী হয় ?

কোথায় যাবে সে ? একটু হাল্কা হবে মন কোথায় গেলে ? বাড়িতে থাকতে কিছুতেই ইচ্ছে করছিল না তার। পিশিমার ওখানে গেলে ত সেই একই বকুনি শুনতে হবে : পিশেমশাই সারাদিন বই-এ মুখ গুঁজে আছেন, তাঁর শরীর যে কী হয়ে যাচ্ছে একবার তাকিয়েও দেখছেন না! তারই অবস্থা পিশিমার। শমীনও কি খুব চিন্তা করে তার জন্যে ?

পিকলুকে নিয়ে উপরে উঠে গেল ভাস্বতী। পিশিমাকে বললে : "পিকলু আপনার কাছে রইল পিশিমা, আমি একটু ঘুরে আসছি।"

"বেশি দেরি করিস নে। ওর সঙ্গে বকর-বকর করতে পারিনে আমি বেশিক্ষণ।"

নীচে নেমে একটু ছিমছাম হয়ে নিতে পাঁচ মিনিটও লাগল না ভাস্বতীর। গীতার ওখানেই সে যাবে।

গীতার ওখানে কেন? বেরিয়ে যেতে-যেতে ভাবছিল সে। নিরঞ্জনবাবুকে সেদিন মনে হল, তিনি দুঃখিত। ভাস্বতীও আজ সত্যি দুঃখিত। আজ বোধ হয় দু'জনার কথা আরো বেশি অন্তরঙ্গ হতে পারবে। মনের ভার তাতে হাল্কা হয়ে যাবে অনেকটা।

ট্র্যামে ওঠা অসম্ভব। রমেশ মিত্র রোড ত! বেশি দূর আর কী! হেঁটেই যাওয়া যাবে। তাছাড়া, একটু হাঁটা ত তার হার্টের পক্ষে ভালোই।

গীতা-নিরঞ্জন দু'জনকেই বাড়ি পাবে ভেবেছিল ভাস্বতী, কিন্তু দেখলে তা নয়। একা, বিষণ্ণ বাইরের ঘরে বসে আছে নিরঞ্জন। ভাস্বতী ঘরে ঢুকেই বললে: "আপনি একা বসে আছেন! গীতা কই? ঘুমিয়েছে বুঝি?"

"আসুন।" একটা মুমূর্ষু হাসি নিরঞ্জনের ঠোঁটে এসেই মিলিয়ে গেল: "গীতা বাড়ি নেই। নীরেনবাবুর সঙ্গে বেরিয়ে গেছে।"

"কোথায় গেছে?"

"আমাকে ত বলে যায়নি। আমিও জিজ্ঞেস করিনি।"

নিরঞ্জনের মুখোমুখি বসে ভাস্বতী একটু নরম হাসলে: "আমি ভাবলাম কোথায় গীতার সঙ্গে একটু গল্প করে যাব।"

"নীরেনবাবু মার্লোন ব্র্যাণ্ডোর ভক্ত, হয়ত তার ছবি এসেছে কোথাও।"

শমীন আর সুপ্রীতিও কি সিনেমায় গেল? একটু বিমর্ষ হয়ে ভাবলে ভাস্বতী। যেখানেই যাক ওরা, নিরঞ্জনবাবুর মতোই মনের অবস্থা ভাস্বতীর।

কিন্তু ভাস্বতী ভাবতে পারলে না, নিরঞ্জনের মনের আবহাওয়া যে

অনেক বেশি সাংঘাতিক। সে যেন ফেটে পড়ল একটা কথায়ঃ "গীতা যদি আমাকে ডিভোর্স করে, আশ্চর্য হবেন না।"

ভাস্বতী যেন আর্ত হয়ে বললেঃ "না, না। আপনার এ আশঙ্কা সত্যি হতে পারে না। গীতা এমনিতেই একটু খেয়ালী।"

"থাক্ গীতার কথা। আপনার কথা বলুন। শরীর এখন ভালো আছে ত আপনার।" খানিকটা মুক্ত হাওয়ায় আসতে চাইল নিরঞ্জন!

"শরীর ভালো না থাকলে কি আর বাড়ি থেকে বেরোতে পারি?"

"ওই দেখুন, ভুলেই গেছি। চা খাবেন ত?"

"না-না। এ সময়ে চা খাইনে।"

"আপনি কী ভাবেন জানিনে—" নিরঞ্জন দার্শনিকের দৃষ্টি আনলে চোখেঃ "আমার মনে হয়, বিবাহিত জীবন মোটেও ভালো নয়।"

"সব-কিছুই খারাপ? ভালোও ত আছে।"

"কী ভালো? ভালোবাসা একটি বস্তু লোপ পেয়ে যায়।"

"পুরুষের বেলায় তা হতে পারে কিন্তু মেয়েদের বেলায় তা নয়। বিয়ের পর মেয়েরা অনেককেই ভালোবাসতে পারে। স্বামী, ছেলে-মেয়ে, শ্বশুর-শাশুড়ি, দেওর-ননদ-জা সবাইকে।"

"স্বামীর বন্ধুবান্ধবকেও, তা-ই না?" শুষ্ক হাসি হেসে ওঠে নিরঞ্জন।

গীতার আচরণে নিরঞ্জন অত্যন্ত দুঃখিত, সেখানে আর ছুঁতে চায় না ভাস্বতী। বলতে পারত, স্বামীরাও স্ত্রীদের বন্ধুবান্ধবদের ভালবাসতে পারে। কিন্তু অন্য কথায় গেল সেঃ "আপনিও ত বেড়াতে বেরোতে পারেন। আমাদের ওখানে যেতে পারেন। সেদিন সুপ্রীতির সঙ্গে ত দেখা হল না। সুপ্রীতির সঙ্গে আলাপ করে সুখী হবেন আপনি।"

"হ্যাঁ। শমীনবাবুর সঙ্গেও ত পরিচয় হল না।"

"আমার কি মনে হয় জানেন, নিরঞ্জনবাবু? আমাদের মন

বড্ড অন্ধকার। সেখানে আলো ফেলতে হয়। অনেকের সঙ্গে মেলামেশাতেই সে-আলো পড়ে। কখ্খনো একা থাকতে নেই।"

"একা থাকব না বলেই ত বিয়ে করেছিলাম।" নিরঞ্জনের হাসিটা সহজ হয়ে আসে।

ভাস্বতীও হাসল। এবং বলতে ইচ্ছা করল তার: "একটু চা খাবেন? আমি করে দিচ্ছি?"

"আপনি খেলেন না, আমি খাব?"

"আরেকদিন এসে খাব যখন খাওয়ার বাধানিষেধ উঠে যাবে। আপনাকে করে দিচ্ছি এখন। কেমন?"

"দিন। আপনার হাতের চা খেতে নিশ্চয়ই ভালো লাগবে।"

ভাস্বতী উঠে ভেতরে চলে গেল।

নিরঞ্জনের মনে হল, ভাস্বতীই যেন তাকে ঠিক-ঠিক বুঝতে পারছে। শুধু বোঝাই নয়, তার যন্ত্রণার উপর যেন মৃদু হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। কেন? সে জানে। তাকেও একা থাকতে হয়। হয়ত তাই সে জানে, বিবাহিত জীবনের নিঃসঙ্গতা কতো ব্যথার।

এমন কথা ভাবে না নিরঞ্জন যে গীতা তাকে ভালবাসে না। কিন্তু নীরেনের আকর্ষণ তার ঢের বেশি। হয়ত কোনোদিন সে মানিয়ে নিতে পারবে অবস্থাটা। হয়ত কোনোদিন নীরেনও গীতাকে আর তেমন আকর্ষণ করবে না। কিন্তু এখন তার সত্যি অসহ্য মনে হচ্ছে দিনগুলো। শুধু আজ, ভাস্বতী এলো বলেই, ভাস্বতীর কথায়-ব্যবহারে যেন একটা মুমূর্ষু বিবর্ণ দিন জীবনের রক্তিম আভায় খানিকটা রাঙা হয়ে উঠ্‌ল।

রাঙা হাসিতেই ভাস্বতী এক কাপ চা নিয়ে ঘরে এলো।

।। কুড়ি ।।

নিরালা হতে পারলে নীরেন সোম গীতার সঙ্গে তাঁর বয়েসের ব্যবধানটা ভুলে যান। গীতাও। নইলে মুক্তির স্বাদ পাওয়া যায় না—নীরেন সোম গীতাকে বুঝিয়েছেন—আর এ-স্বাদ ছাড়া জীবনে আর পাবার মতো কী-ই বা আছে ?

সে বিকেলে বালিগঞ্জের ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে নীরেন সোম গীতাকে বললেন ঃ "লেকে যাব। গোলমোর ফুল দেখতে।"

"তুমি বুঝি ওয়ার্ডস্বার্থের ভক্ত ?"

"ফুলের ভক্ত। জওহরলালের মতো বাটনহোলে গোলাপ গুঁজতে ইচ্ছে করে আমরাও।"

"সে আলাদা কথা। ফুল-ফোটা দেখতে যাওয়া ত রীতিমতো কবির রোগ।"

"কবিতা পড়াই, কবির রোগে ধরবে না ?"

মাথা নেড়ে নেড়ে হাসতে লাগল গীতা।

নীরেন সোম আবার বললেন ঃ "আরেকটা কবির রোগ আমার আছে। মেয়েদের ভালোবাসা।"

ট্রাম এলো। দুর্দ্দান্ত ভীড়। ট্রামে ঠেলাঠেলি দাঁড়িয়ে বিকেলটা মাটি করতে চাইলেন না নীরেন সোম। ট্যাক্সি খুঁজলেন। তা-ও কি সহজ-লভ্য ?

"লেকে যাবে ? ঝড় এলে ?" গীতা বললে।

ট্যাক্সি খোঁজায় মন রেখে নীরেন সোম বললেন ঃ "ঝড় ত এসেইছে।"

"তাহলে নামটা পাল্টে প্রভঞ্জন নিয়ে নাও।"

পশ্চিমের পুরোপুরি আকাশটা মেঘ-ঢাকা। যেমন মাঝে-মাঝে

বর্ষার বিকেলে হয়, মেঘ-লাগা একটা আশ্চর্য হলুদ আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। কনে-দেখা আলো। গীতার মুখে হলুদ আভায় একপলক তাকিয়ে নীরেন সোম বললেন: "আজ আমাদের হলুদ দিন। বিকেলটা হলুদ হয়ে গেছে—হলুদ গোলমোর দেখতে যাচ্ছি আমরা"

গীতা একটা সস্তা রসিকতা করলে: "তবু ভালো যে গায়ে-হলুদের দিন বলো নি!"

"তোমার গালের রঙ দেখলে তা-ই অবশ্যি মনে হয়।" একটা ট্যাক্সিকে তাক করছিলেন নীরেন সোম। ডাকলেন। ট্যাক্সি এসে ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়াল।

ট্যাক্সিতে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে গীতা বললে: "লেক না-হয় ময়দান, গঙ্গার ধার কি পার্কস্ট্রীটের রেষ্টুরেণ্ট—জায়গাগুলো সব পুরনো হয়ে গেছে!"

"In the mountains there you feel free—গ্রীষ্মের ছুটিতে দার্জ্জিলিং গেলে হয়।"

"সে-ই ত ম্যলে বেড়ানো, না-হয় টাইগার-হিলে সূর্যোদয় দেখা!"

"এবার কোথায় যেতে ইচ্ছে? কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী ত হয়ে গেছে। বিদেশ?"

"টাকা থাকলে নিশ্চয় যেতাম। আজকাল আমেরিকা কে না যাচ্ছে?"

"আমেরিকা—চেরী-উৎসবের দিনে!" নীরেন সোম যেন মনে-মনেই বললেন। আর একটুকরো স্বপ্নের মতো ছবি মনে এলো তাঁর। চেরী-বাগানের ফুলন্ত ছায়ায় বসে আছে সে আর গীতা—হোটেলে ফেরার তাড়া নেই। কথার ফুল ফুটে উঠছে একটি-দুটি দুজনারই মান।

রবীন্দ্রসরোবরের উত্তরের রাস্তায় ট্যাক্সি এসে পৌঁছল।

গীতা বললে: "ছাখো, ফুল ছাখো।"

"ওপারে যাব। সেখানেই নিরিবিলি। এ-পারের গাছগুলোও ঠিক দেখা যাবে।"

দক্ষিণের রাস্তায় ট্যাক্সি বাঁক নিলে।

পাইপটা এতোক্ষণ মুখে ছিল না নীরেন সোমের। হাতে নিয়ে তাতে তামাক টিপলেন এখন।

কামান-ঘটোর কাছে এসে ট্যাক্সি থামালেন তিনি। ড্রাইভারকে বিদায় করে লেকের জল ঘেঁষে দাঁড়ালেন। তামাকে আগুন দিয়ে বললেন: "বৈশাখ এলেই আমার মনে পড়ে,

April is the cruellest month, breeding Lilacs out of the dead land..."

"তোমার মৃত মনে লাইলাকের বদলে নিশ্চয়ই গোলমোর ফোটায়।" গীতা হাসতে থাকে।

"সবার মনেই কিছু-না-কিছু ফোটে। Is'nt it a picture of human condition. ?"

"বৈশাখ এলে আমার পঁচিশে বৈশাখের কথাই মনে আসে।"

"বেশ, তাই মনে আনো। রবীন্দ্র-সরোবরেই ত এলে।"

ওরা বসল। এদিকে তেমন হাওয়া নেই। আর রেল-লাইনটা কাছে। তবু নিরিবিলি। ক্বচিৎ কদাচিৎ কেউ এ-রাস্তায় আসে।

ঢেউগুলো সাঁতার কেটে ওপারে যাচ্ছিল। দু'টো বাচের নৌকা জলের আনন্দঘন ছবিটাতে আঁচড় কেটে গেল। গীতা জলে তাকিয়ে ছিল—চোখ সরিয়ে আনল নীরেনের মুখের উপর। পাইপে নিবিষ্ট ছিলেন নীরেন সোম। চিবিয়ে বললেন: "নিরঞ্জন—"

গীতার চোখ আরো একাগ্র হল। হঠাৎ নিরঞ্জন কেন নীরেনের মুখে?

"নিরঞ্জনের মনকে আমরা খুব ডিসটার্ব করছি, তা-ই না?" কথা সমাপ্ত করলেন নীরেন সোম হাতে পাইপ নিয়ে।

"তা কেন?" মৃদু আপত্তি জানালে গীতা।

"তাহলে বলতে হয় taste of love-এর চাইতে he prefers taste of himself। খানিকটা religious হলে যা হয়!"

গীতা এ-আলাপে যেতে চায় না। নিরঞ্জনকে মনে আনবার জন্যে ত সে নীরেনের সঙ্গে আসে না। আসে বিবাহপূর্ব দিনগুলোর স্বাদ আবার ফিরে পেতে। আটপৌরে ঘর-সংসার হতে ছুটি পেতে কতগুলো দুর্লভ মুহূর্তে। নীরেনের উরুর উপর একটা হাত রেখে গীতা জিজ্ঞেস করে: "তুমি 'শেষের কবিতা' পড়েছ?"

"ও, নিশ্চয়। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ বই।"

"লাবণ্যকে আমার খুব ভাল লেগেছে।"

চোখ সরু করে হাসেন নীরেন সোম। পাইপ মুখে তোলেন আবার।

হলদে আলোটা অনেকক্ষণ সরে গেছে। মেঘও নেমে গেছে পশ্চিমে। কালবোশেখী আর আসবে না ঠিক। আকাশ পরিষ্কার থাকলে সন্ধ্যার পরেও খানিকক্ষণ বসা যাবে।

বজবজের দিকে একটা ট্রেন চলে যাচ্ছে।

গীতা বল্‌লে: "সত্যি, গ্রীষ্মের ছুটিতে কোথাও গেলে হ'ত।"

"দীঘা, পুরী, গোপালপুরও ভালো—সমুদ্রেরধারে।"

"ক্লাশ করে এসে এমন ক্লান্ত লাগে মন!"

"ক্লান্ত হওয়াটা এ-শতকের রোগ।"

"তোমরা কলেজে হয়ত ইণ্টেলিজেণ্ট ছেলে পাও; তাই পড়িয়ে আরাম। স্কুলের মেয়েদের পড়ানো যে কি পরিশ্রম? কিছুই যেন মাথায় ঢোকে না ওদের।"

পাইপের পোড়া তামাক ঠুকে ঠুকে ফেলতে থাকেন নীরেন সোম। বলেন: "খাঁটি টীচারের মতো কথা বলছ!"

"যা-ই ভাবি আর যা-ই করি, আমি ত টীচার-ই।"

"কিন্তু যা-ই তুমি বলো, দেখতে কিন্তু মোটেও টীচারের মতো নও।"

"নই? তবে?"

"একটি টাটকা মেয়ের মতো।"

"ও।" হেসে গীতা মুখ গোঁজার মতো করে নীরেনের কোলে।

সন্ধ্যা হয়েছে। নীরেন সোম দু'হাতে গীতার মুখ তুলে ধরে বললেন: কী বলো, we are still in a world where the man & woman can find that they belong to each other."

॥ একুশ ॥

তখন সন্ধ্যা পেরিয়ে একঘণ্টা হয়ে গেছে। ঝরঝরে শরীর-মনে গীতা বাড়ি ফিরে এলো। নীরেন সোম ট্রাম থেকে নামেননি, মধ্য-কলকাতায় তাঁর ফ্ল্যাটে চলে গেছেন।

নিরঞ্জন তখন লে-হাণ্ট পড়ছিল। শেলী-কীট্‌সের উপর লেখা হাণ্টের রচনাবলী। ভাস্বতী তার মনের উপর থেকে কালো পর্দাটা সরিয়ে দিয়ে গিয়েছে। পড়াশুনোয় মন দিতে পারছিল তখন থেকে সে।

ঘরে ঢুকেই গীতা নিরঞ্জনকে খুশী করবার জন্যে মেতে উঠল: "নিশ্চয় চা খাওনি আর? ঝি যা চা তৈরী করে, মুখে তোলা যায় না। খাবে কী? 'জনতা'য় এক্ষুণি চা করে দিচ্ছি আমি। খাবার কী খাবে বলো—লুচি, হালুয়া, আলুভাজা?"

ভাস্বতীর কথা চেপে গেল নিরঞ্জন। চা খাওয়ার কথাও। বই থেকে উদাস চোখ তুলে বললে: "ওই তিনটের একটা হলেই চলে!"

"তুমিও এসো আমার সাহায্যে। প্রেসিডেন্ট কেনেডি-ও রান্নাঘরে যান এবং রুটি কাটতে আঙুল কেটে ফেলেন।" গীতা হাসতে থাকে। যেম্নি নীরেন সোমের পাশে বসে হেসেছে তেম্নি।

"আলুর খোসা ছাড়িয়ে দিতে পারি—আর কিছু না।"

"তাতে আঙুল কাটার ভয় আরো বেশি।"

বই ছেড়ে উঠল নিরঞ্জন: বাড়িতেই "যখন থাকি, ডি-এইচ লরেন্সের মতো রান্নার কাজটা শিখলে ভালো হত!"

গীতা শাড়ি পাল্টাতে চলে গেল ভেতরের ঘরে। তার বেরিয়ে যাওয়ার উপর এর চাইতে রূঢ় কটাক্ষ নিরঞ্জন করবে না। সে জানে।

গীতার মনে সামান্য অপরাধ-বোধ নেই। সে ভাবে, সে যখন নিরঞ্জনকে ভালোবাসে, তখন আর তার অপরাধ কী?

কিন্তু নিরঞ্জন আহত। উঠে দাঁড়িয়েও সে পা বাড়াল না রান্নাঘরের দিকে। গত কয়েকটা ঘণ্টার হিসেব নিকেশ গীতার কাছে সে জানতে চাইবে না ঠিক। কোনোদিনই না। কিন্তু তবু ত তার মনে আসে কতগুলো ছবি। বিয়ের আগে তার সঙ্গে গীতা যে ভঙ্গীতে মেলামেশা করত, এখন নীরেন সোমের সঙ্গে তেমনই ত করে সে! জিজ্ঞেস করে কী আর জানবে নিরঞ্জন! তাতে কি মনের ক্ষত বুঁজে আসবে?

এ তো মিথ্যা প্রচার ছাড়া আর কিছু নয় যে বিয়ে নরনারীর জীবন এক করে দেয়! এখন এমি স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় মেয়েরা যে বিয়ে করলেও তার জীবন তার নিজস্বই থেকে যায়। নিরঞ্জন তা-ই ভেবে গীতাকে সহ্য করে যাচ্ছে। যাবেও।

রান্না-ঘরে গেল নিরঞ্জন। গীতা ষ্টোভ ধরিয়ে দিয়েছে। ময়দা মাখছিল এখন। বললে: "লুচি বেলতে হবে। পারবে?"

"ও আর কী?" নিরঞ্জন বসে গেল।

কিন্তু বেলতে যখন সুরু করলে, একটা লুচিও গোল হল না। চতুষ্কোণ, লম্বাটে বা কিম্ভূতকিমাকার হতে লাগল সব। গীতা দেখে বললে: "খাবে তুমিই—যা খুশী করো।"

"তুমি খাবে না?"

"গোল লুচি তৈরী করতে পারো ত সেটা খাব।"

"গোল হচ্ছে না যে কিছুতেই।"

উনুন ছেড়ে এসে ঝি-ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছিল। এখন বললে: "আমি করে দিচ্ছি দাদাবাবু, দিদিমণির লুচি।"

"বাঁচালে, বাবা।" নিরঞ্জন উঠে গেল।

এমন মুহূর্তও আসে, হাল্কা হাওয়ার মতো যার ছোঁওয়া, যখন কেউ ভাবতে পারবে না, নিরঞ্জনের মনে কোনো যন্ত্রণা আছে বা

গীতার মনে ব্যভিচার। ওরা নিজেরাও হয়ত ভুলে যায় অতীতের সব কিছু, ডুবে যায় এই মুহূর্তগুলোতে।

গীতা বলেঃ "যেওনা। দাঁড়িয়ে ছাখো কী করে লুচি ভাজতে হয়। সবদিনই যে আমি করতে পারব এমন ত নয়। আমার অসুখও করতে পারে।"

"সেদিন আমার লুচি না খেলেও চলবে।"

"বাইরে খেয়ে আসবে এক কাঁড়ি টাকা খরচ করে, তা-ই না?"

"চিকেন তন্দুরী খেতে যাবে একদিন?" বিয়ের আগেকার দিনগুলো বুঝিবা হাতড়ায় নিরঞ্জন।

ক্ষিপ্র হাতে গীতা লুচিগুলো ভেজে তোলে। তারপর চায়ের জল বসিয়ে বলেঃ "যাব।"

উনুনে আলুভাজা হয়ে গেছে। গীতা ঝিকে বলেঃ "জল গরম হলে পটে করে নিয়ে এসো ও ঘরে—চা-চিনি-হুধও। লুচি, আলুভাজা আমি নিয়ে যাচ্ছি।"

ওরা চলে এলো বসবার ঘরে।

পাশাপাশি বসে নিরঞ্জন হয়ত ভাস্বতীকে ভাবল একটু, খানিকক্ষণ আগে যে গীতারই মতো এম্নি বসে গেছে। হয়ত গীতাও ভাবল নীরেন সোমকে যার পাশে বসে সে কাটিয়ে এলো এ-সন্ধ্যাটা। কিন্তু এ ভাবাতে কী হয়! এখন ত নিরঞ্জন আর গীতাই পাশাপাশি। যাদের পাশাপাশি থাকা স্বাভাবিক, তারাই।

নিরঞ্জন বলেঃ "আটটায় এসব খেয়ে ন'টায় ভাত খাওয়া যাবে?"

"ভাত খাওয়া না-হয় দশটাতেই হল। একদিনের অনিয়মে কী হয়?" গীতা ঠিক হু'টো গোল লুচি মুখে নিল আর একটাও না।

"তুমি ত হু'টো খেয়েই হাত তুললো আমার জন্যে ত পড়ে রইল একগাদা"

"খাও না; পড়াশুনা করেছ এতোক্ষণ, নিশ্চয় ক্ষিদে পেয়েছে।"

ঝি চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে এলো। পটে চা ফেলে কাপ সাজাতে ব্যস্ত হল গীতা।

নিরঞ্জন লুচির টুকরো আর আলুর কুচি মুখে পুরে বললে:
"শুনছি তোমাদের স্কুল-ওয়ার্কিং ডেজ না কি বেড়ে যাবে?"

"বাড়লে কাজ ছেড়ে দেব।"

"স্কুলের ছুটি আর কেনো কাজেই পাবে না।"

"চাকরিই যদি না করি! খাওয়াবে না আমায়?"

"শুধু ডালভাত।"

"চিকেন তন্দুরি আর নয়?"

"তণ্ডুলেরই যা দাম চড়ছে, তাতে আবার তন্দুরি!"

"আমার অসুবিধে নেই। সৎমায়ের ঘরে আমি মানুষ। না খেয়েও থাকতে পারি দু'চারদিন!"

স্বামী-স্ত্রীর এই অন্তরঙ্গ কথাবার্তায় কোনো খাদ নেই। এ মুহূর্তে নিরঞ্জন ভাবতেই পারে না যে নীরেন সোম এলে এই গীতাই অন্য রকম হয়ে যায়। তাদের অন্তরঙ্গতায় সে যেন তখন ট্রেস্‌পাসার। সত্যি। 'ট্রেসপাসার'। লরেন্সের গল্পটা মনে পড়ে। নিরঞ্জন মরে গেলে গীতাও হয়ত নীরেন সোমের আলিঙ্গনে শান্তি পাবে। খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। না হলে, হয়ত আর খাওয়া হত না। চা-টা খেতে পারবে ত সে, যে চা গীতা এখন কাপে ঢালছে?

নিরঞ্জনের চা টি-পয়ে রেখে গীতা হেসে বললে: "তুমি কি সত্যি আমাদের ভবিষ্যৎ অভাবের ছবি দেখতে সুরু করেছ না কি?"

"অভাব কি এখনই চলছে না?"

"হাঁ—গাড়ি-বাড়ির অভাব ত আছেই।" গীতা চায়ে চুমুক দেয়। হাতে চায়ের কাপ নেয় না নিরঞ্জন, কথাও বলে না।

"তিনটাকা পাউণ্ডের চা—ঠাণ্ডা হলে আর খেতে পারবে না।" গীতা আবারও বলে।

চায়ে মন দেয় নিরঞ্জন। ভাবে, গীতার তৈরী চা এখনো ভালো। কিন্তু ভাস্বতীর তৈরী চা যেন আরো ভালো ছিল।

॥ বাইশ ॥

নিরঞ্জনই ভাস্বতীকে বাড়ি-ফেরার ট্যাক্সি করে দিয়েছিল। ট্যাক্সিতে বসে ভাস্বতী একটা কথাই ভেবেছে, শমীনের আচরণের একটু মৃদু প্রতিবাদ আজ সে করতে পারল। জীবনে এই-ই প্রথম। দিল্লীতে তার চোখের আড়ালে কী ঘটেছে সে জানে না, না জেনে সে সুখীই ছিল। সুখী বা থাকবে না কেন? যা-ই সে করুক ভাস্বতীর সঙ্গে ব্যবহারে ত শমীন সবসময়ই হার্দ্য।

আজও তা-ই। ভাস্বতী ঘরে এসে দেখল, শমীন চুপচাপ বসে আছে। তাকে দেখেই সে নড়েচড়ে উঠল: "একা কোথায় বেরিয়েছ তুমি? জানিয়ে যাও নি। আমরা ভেবে মরি।"

"ডাক্তার ত বলেছেন আমাকে একটু পরিশ্রম করতে।" সাজ পরিবর্তনে মন দিল ভাস্বতী।

"তাহলে আমার সঙ্গে বেরোলেই ত পারতে।" ভাস্বতীর বিশ্বাসভাজন থাকবার জন্যেই শমীন বললে। আর ভাস্বতী তাতেই জল হয়ে গেল। কোনো অভিযোগই আর তার মনে রইল না। হেসে বললে: "কাল থেকে বেরোব।"

আমি যদি স্থির থাকি তাহলে আমার চারদিকের পৃথিবী একটুও নড়বে না—ভাস্বতীর এই ধারণা। এখন সে বিমর্ষ হয়ে ভাবলে, কেন সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল! এ ত তারই চরিত্রের দুর্বলতা। তার বিশ্বাসে স্থির থাকতে পারেনি সে। শমীন যদি সুপ্রীতির দিকে একটু ঝুঁকেও থাকে, ফিরে ত এলো সে! অন্তত বাড়ি ফিরে ত ভাস্বতী দেখতে পায় নি শমীন সুপ্রীতির সঙ্গে গল্প করছে!

"পিকলু কই?" জিজ্ঞেস করলে ভাস্বতী।

"ও ঘরে।"

ভাস্বতী সুপ্রীতির ঘরে এলো। সুপ্রীতি বললেঃ "এসো। বাঃ, তোমাকে ত বেশ ফ্রেশ দেখাচ্ছে।"

"বাইরের হাওয়া লেগে।"

কথা বন্ধ হওয়াতে ভুরু কুঁচকালো পিকলু। মার সঙ্গে তার আড়ি-টা বেড়ে গেল। সুপ্রীতির গা-ঘেঁষে বসে বললেঃ "মার সঙ্গে কথা বলো না প্রিটি।"

"না-না, তোমার সঙ্গেই বলব।" সুপ্রীতি জড়িয়ে ধরল পিকলুকে।

"ঠাকুমাকে জ্বালাতন করে এখন প্রিটিকে জ্বালাতন করতে এসেছ, না?"

পিকলু মার কথায় কান দেয় না। বলেঃ "তুমি কাজ করো না কেন, প্রিটি?"

"তোমার মা-ও ত করেন না। দেখছ?"

"দিল্লী থাকতে করতেন।"

ভাস্বতী বলেঃ "ভাখো, কেমন পাকা হয়ে উঠছে!"

সুপ্রীতি পিকলুকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতেই যেন ইচ্ছা দেখায়। ভাস্বতীর সঙ্গে কথা বলতে কেমন যেন বাঁধ-বাঁধ লাগছিল তার। পিকলুকে গল্প শোনায়ঃ "তোমার মার ত অনেক পয়সা—তাই কাজ করেন না। জানো, আমার একটা ভালো শাড়ি কেনবারও পয়সা নেই!"

"মার কাছে চাওনা কেন?"

"তোমার কাছে চাইব; তুমি বড়ো হও। তখন।"

"তুমি এখন খাবার ঘরে যাও, ঢের কথা হয়েছে।" ভাস্বতী বলে পিকলুকেঃ "এখন আমরা কথা বলব। বড়দের কথায় বাচ্চাদের থাকতে নেই।"

পিকলু অনিচ্ছায় চলে যায়। এখন সুপ্রীতি ভাস্বতীর মুখোমুখি। খানিকটা আশঙ্কায়ই কেঁপে ওঠে তার বুক।

ভাস্বতী হেসে জিজ্ঞেস করেঃ "কদ্দূর পর্যন্ত গিয়েছিলে তোমরা?"

অনেক দূরই ত আজ যাওয়া হয়েছে। সুপ্রীতি কালো হয়ে ওঠে। আলগাভাবে বলে : "ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল।"

"তুমি বিকেলে বেরোওই না। বেরোনো ভালো।"

"তোমার তা অভ্যাস আছে। আমার নেই।"

"সত্যি, অনেকদিন পর আজ একটু বেরিয়ে আমার খুব ভালো লাগছে।"

"ভালো লাগাই তোমার দরকার। হার্টের অসুখে মন খারাপ হতে দিতে নেই।"

"মন ভালো রাখার ওষুধ ত তুমিই আছো।"

"আমি আর কতটুকু সময় তোমার সঙ্গে থাকি! গ্রীষ্মের ছুটি আসছে, তখন অবশ্যি সারাদিনই থাকা যাবে।"

"গ্রীষ্মের ছুটিতে কোথাও গেলে হত। শুধু তুমি আর আমি।"

"পিকলু, শমীনবাবুকে ছেড়ে তোমার ভালো লাগবে? না।"

"আমাকে ছাড়াও ত ওদের চলেছে।"

সুপ্রীতি চুপ করে থাকে। ভাস্বতী যে স্বামী ছেলে থেকে একটু দূরে সরে পড়েছে সে-ব্যথা যেন সে ভুলতে চায়। দূরে সরে পড়ল কি সুপ্রীতি আছে বলে। তাছাড়া আর কি? পিকলুকে সে যে আপন করে নিয়েছে তাতে ত আর ভুল নেই! পিকলুর সঙ্গে কিছুক্ষণ আগেকার কথাবার্তাগুলো নিশ্চয়ই ভাস্বতী পছন্দ করেনি। তাছাড়া, শমীনবাবু ত তাকে পাবার জন্যে, দু'হাত বাড়িয়েই আছেন। শমীনবাবুর জন্যে যদি তার বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষাও থাকে—আছে কিনা সে বুঝতে পারছে না—তবেই ত ভাস্বতীকে সে দূরে ঠেলে দিল!

"আরেকদিন বসে ঠিক করা যাবে, কেমন, কোথাও যাব কিনা।" ভাস্বতী বললে।

রাত্রিতে তিনজনই খাবার টেবিলে ছিল, শমীন, ভাস্বতী, সুপ্রীতি। কথা বলছিল শমীনই, ওরা দু'জন প্রায় চুপচাপ। সুপ্রীতির সঙ্গে কথায় আবার 'আপনি'তে ফিরে এসেছে সে। তা শুধু ভাস্বতী সামনে আছে বলে।

"আজও আপনি কম খাচ্ছেন। বেড়ালে ক্ষিদে পাওয়া উচিত।" সুপ্রীতির দিকে তাকিয়েছিল শমীন।

সুপ্রীতি একটু হাসলে, বললে না কিছুই।

"আজ তুমি মেন্যুটা যাচ্ছে-তাই করেছ ভাস্—না, ও, তুমি ত ছিলেই না, নিতাই-এরই রাজত্ব গেছে!" শমীন বললে

"একদিন কম খেলে কিছু হয় না।" ভাস্বতী বললে।

"ঘুম হবে না।"

"একদিন ঘুম না হলেও ক্ষতি নেই।

তারপর চুপচাপ মুখ-হাত ধুয়ে যে-যার ঘরে চলে গেল। সুপ্রীতির মনের ভার কাটেনি। শমীনের মুখে সে তাকাতে পারছিল না খেতে বসে পাছে সে-মুখে একটা অতৃপ্ত ক্ষুধার ছায়া দেখতে পায়। ভাস্বতী হয়ত শমীনকে ক্ষমা করেছে, তাকেও ক্ষমা করেছে কিন্তু তাতেই কি সব' আগেকার মতো হয়ে গেল? আলো নিবিয়ে চেয়ারে নিশ্চল বসে রইল সুপ্রীতি অনেকক্ষণ। দরজা খোলা। ঘুমুবে না এখন—ঘুম আসবে না, তাই।

দরজার দিকে তার পিঠ। হঠাৎ কাঁধে একটা ছোঁওয়া পেয়ে চমকে বললে সুপ্রীতি: "ভাস্বতী?" তাকাল ও ফিরে। না। শমীন।

শমীন বললে: "ভাস ঘুমিয়ে পড়েছে—আমার ঘুম হচ্ছে না। তুমিও যে ঘুমোও নি বেশ হ'ল।"

কি বলবে সুপ্রীতি? জিব যেন তার অবশ হয়ে গেছে। কিন্তু স্পষ্ট সে অনুভব করল, কাঁধের হাতটা তার চিবুকের নীচে এলো, আর শমীনের মুখ তার মুখের উপর।

॥ তেইশ ॥

আজ স্কুল হয়েই গ্রীষ্মের ছুটি। খুশীতে লতিকা খুব ভোরে উঠে গেছে। তৃপ্তি তখনও ঘুমোচ্ছে। সুলেখা, সুষমা, কৃষ্ণা—ওরাও। লতিকা তৃপ্তিকে ঘুম থেকে ঠেলে তুলতে চায়ঃ "ওঠো, ওঠো তৃপ্তিদি গ্যাখো কেমন সুন্দর মুক্তো-রং ভোর।"

না উঠেই তৃপ্তি বলেঃ "ভোর ত শাদাই হয়।"

"কেন গোলাপী হয় না? সবুজও হয়।"

"হলেই বা তাতে কী?" ফুলো-ফুলো চোখ মেলে তাকায় তৃপ্তি।

"যেদিন এমন ভোর থাকে আমার দিনটা ভালো যায়।"

"দিন ত ভালোই যাবে—আজ ছুটি, কাল মেদিনীপুর।"

"আজ বলে নয়, যখনই এমন ভোর থাকে তখনই।"

"সে কেমন?" তৃপ্তি হাসেঃ "একগুচ্ছ রজনীগন্ধা পাঠায় কেউ?"

"দূর, তা কেন? এই ধরো, খেতে বসলে ঠাকুর মাছের বড়ো টুকরোটা আমায় দেয়। স্কুলে গেলে, হুকুম আসে না, টেনে আমাকে একটা ক্লাশ নিতে হবে। 'বিশ্ব ইতিহাস প্রবেশিকা' পড়াই আর আপন মনে নিজের থিওরি শোনাই সেভেনের মেয়েদের।"

তৃপ্তি বিছানায় উঠে বসেঃ "থিওরি? কি থিওরি?"

"বইটাতে ত ভারতবর্ষের কোনো কথা নেই, সব মিশর-টিশর। সেসব পড়াতে গিয়ে আমি সিন্ধু-সভ্যতার কথা বলি।"

"তার ত কিছুই জানা যায় না। কী বলো?"

"জানা যায় না মানে? ওখানে ব্রাহ্মী-লিপি প্রথম লেখা হয়। ভারতের লিখিত ইতিহাসে অশোক-মৌর্যকেই প্রথম ও লিপি ব্যবহার

করতে দেখা যায়। মৌর্যরা যে সিন্ধু-অঞ্চলে ছিল তা আমরা আলেকজান্দারের ভারত-আক্রমণের বিবরণে পাই। তাছাড়া, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সঙ্গেও আলেকজান্দারের দেখা হয়েছিল। আমার থিওরি তাই ঃ সিন্ধুসভ্যতার ব্রাহ্মীলিপির স্তরটা মৌর্যদের পূর্বপুরুষেরই তৈরী।" ক্লাশ-পড়ানোর মতোই বলে যায় লতিকা।

"তুমি সুলেখাদির ঘরে গিয়ে থিসিস লিখতে সুরু করো।"

"ছোড়দাও ত লিখছেন হিষ্টরিতে এম-এ দিতে।"

"তার আগেই ত হিষ্টিরিয়াতে পেয়েছে তোমাকে!"

মুখ গম্ভীর করে তোলে লতিকা ঃ "মানে ?"

"আবোল তাবোল বকতে সুরু করেছ!"

"কোপারনিকাসকেও পাগল ভেবেছিল খ্রীষ্টানরা।"

"যাক্—চেঁচামেচি করে ত তুমি আমার ঘুম ভাঙালে—এখন দাও আমার টুথপেষ্ট আর ব্রাশ।"

তৃপ্তির হাতে ওসব তুলে দিয়ে লতিকা বলে ঃ "আজ সত্যি মেদিনীপুরের কথা মনে হচ্ছে—ছেলেবেলার কথা। ছুটির দিনে কী ভোরেই না উঠতাম।"

"মেদিনীপুরে কী আছে মনে রাখবার মতো ?" মাড়িতে পেষ্ট ঘষতে সুরু করে তৃপ্তি, তারপর ব্রাশ চালাবে।

"নেই মানে ? একদিন ভোরে কাঁসাই নদীর ধারে হাঁটলে তুমি আর ভুলতে পারবে না। তাছাড়া বিকেলবেলা 'ভিটা-হাউসে' যাও, দোতলার বারান্দায় বসে চা খাও—সে কি তোমাদের কফি-হাউসের মতো হাজতঘর ? কবি-যাত্রা-জলসা ত লেগেই আছে—গান শুনতে ভালোবাসি আমি সাধে ?"

"নষ্ট্যালজিয়া!" মুখ-ভরা ফেনা নিয়ে বললে তৃপ্তি। তারপর থু-থু ফেলে এসে বল্‌লে ঃ "মিনিকে ভালো দু'-কাপ চা করতে বলো ত! সকালের চা-টা ভালো হলে দিনটা ভালো যায়।"

গানের সুরের মতো লতিকা বলে ঃ "I don't want any more hugs/Make me some fresh tea—"

"'সানি-কটে'র যোগ্য বাসিন্দে হয়ে উঠেছ দেখছি—ইংরেজির প্রেমে মত্ত!"

"সুলেখাদির একটা বই-এ কবিতাটা পড়েছিলাম।" লতিকা কামিনীর খোঁজে চলে গেল।

মুখ ধুয়ে এসে তৃপ্তি বিছানায় বেড-কভার বিছালো। অলস হাতে। ছুটির দিন আসছে। তার মানে ত অলস দিন। এখন থেকেই যেন আলস্য ভর করেছে শরীরে। ছুটিতে কি বীডন ষ্ট্রীটের বাড়িতে যাবে তৃপ্তি। কী কাজ গিয়ে! ওয়েষ্ট জার্মানী থেকে দাদা এখনো আসেন নি। 'সানি কট' ত খোলাই থাকছে। কৃষ্ণা থাকবে, সুলেখাদি থাকবেন, তিনদিনের জন্যে সুষমাদি সিউড়ি যাবেন। লতিকা থাকবে না, তাই একটু অসুবিধে। তবু মনটা আজ হাল্‌কা। ছুটি এসে গেল তাই। আর তার মানে, টীচিং-লাইন তার ভালো লাগছে না। সত্যি, এখানে সে খাপছাড়া। টীচারের কী সুখ? বাচ্চা মেয়েরা সম্মান করবে। এ আবার একটা সুখ না কি? বেশ করেছে ভাস্বতী। বিয়ে করে যে টীচারি ছেড়ে দিয়েছে।

লতিকা-ই দু'-কাপ চা নিয়ে আসে, বলে: "সুলেখাদির পরিচর্যার শেষে মিনি টোষ্ট নিয়ে আসবে।"

"কিন্তু তোমাকে এমন গোলাপী দেখাচ্ছে কেন? তুমিই চা করে নিয়ে এলে নাকি?"

"দিনটাই আজ আমার গোলাপ ফুল।" তৃপ্তির হাতে চায়ের কাপ তুলে দিয়ে লতিকা তার গা-ঘেঁষে বসল।

"তা হলে ত তোমাকে আজ অন্তত একটা গোলাপফুল কিনে দিতে হয়!"

'You gave me hyacinths first a year ago./They called me the hyacinth girl" হেসে ওঠে লতিকা।

"বেশ, বেশ। তোমাকেও গোলাপ-বালা ডাকতে বলে দেব সবাইকে।"

"হায়াসিন্থ গার্ল নামটা কী ভালো আর গোলাপবালা শুনতে কী বিশ্রী!"

এক চুমুক চা খেয়ে তৃপ্তি হেঁকে উঠল: "মিনি, চা জুড়িয়ে জল হলে তুমি টোষ্ট আনবে নাকি!"

"এই ত যাচ্ছি, দিদিমণি!" কামিনীর গলা শোনা গেল। আজ সে সবাইকে তুষ্ট রাখতে ব্যস্ত। ছুটির বকশিশের লোভে।

"খালি পেটে চা খেতে নেই—খেয়োনা তৃপ্তিদি!" লতিকা বললে।

"এতো ইংরেজি বলছ আর ইংরেজের ফ্যাশানটা জানো না—বেড-টী খাওয়া? সে কি ভরা পেটে খায়?"

"আজ গীতাদির বাড়ি গেলে কেমন হয় তৃপ্তিদি—ওখানে নাকি নীরেনবাবু মুখে-মুখে ইংরেজি কবিতা বলেন।"

"গীতা বলেছে? ও, তাই তুমি ওখানে যাবার জন্যে তৈরী করছ নিজেকে!"

"গীতাদি ত যেতে বলেনই।"

"নীরেনবাবুর সঙ্গে ভিড়িয়ে দিতে?"

"যাঃও, আমি কি অকূলে পড়েছি?"

টোষ্ট নিয়ে কামিনী এলো। খানিকক্ষণের জন্যে ওদের কথা বন্ধ হল। খেতে থাকলে তৃপ্তি কথা বলে না।

কিন্তু লতিকা চুপ থাকতে পারে না বেশিক্ষণ। বলে: "তুমি অনেকদিন ফটো তুলছ না, তৃপ্তিদি! গ্রুপ ফটো তুলবে আজ? বল্‌ব সুষমাদিকে?"

তৃপ্তি টোষ্ট চিবিয়ে শেষ করে।

লতিকা অন্য কথায় যায়: "সুপ্রীতিদির সঙ্গে কথা বলেছ আজকাল? কী ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেছেন!"

উষ্ণ চা এক চুমুকে খেয়ে নেয় তৃপ্তি। টেবিল থেকে এলাচের কৌটো তুলে আনে। এলাচদানা মুখে দেয়।

"পান খেতে সুরু কর তৃপ্তিদি। জর্দা-পান। "জর্দার গন্ধটা আমার বেশ লাগে।" লতিকা তখনও টোষ্ট চিবোয়।

"সুরু করব। শীগগীরিই।" ঝিরঝির হেসে ওঠে তৃপ্তি।

"তা-ই নাকি?" খুশীর গলায় বলে লতিকাঃ "তাহলে ত গ্রুপ ফটো তুলতেই হয় আজ। কোনদিন থাকো, না থাকো!"

"সে ত তোমার বেলায়ও। মেদিনীপুর থেকে ফিরে এসো, কি না এসো। তাই ত একটা গোলাপ ফুল দেব তোমাকে।"

খুশীতে লতিকা তৃপ্তির গায়ে ঢলে পড়ে।

॥ চব্বিশ ॥

ভাস্বতী লক্ষ্য করছিল, যেদিন সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল শমীন আর সুপ্রীতির ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যালে যাবার পর, তারপর থেকেই সুপ্রীতি যেন কেমন আনমনা। এখন ওর ছুটি। গল্প করার অবসর ঢের। কিন্তু কথাই যেন বলতে চায় না। কথা বলতে গেলে থেমে যায়।

কাজেই দুপুরে দু'জন একসঙ্গে খেতে বসে আজ যখন সুপ্রীতি বললেঃ "তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে ভাস্বতী, দুপুরে পিকলুকে ঘুম পাড়িয়ে আমার ঘরে এসো।" তখন ভাস্বতী মনে মনে খুশী হল। আগেকার মতো গল্প হবে হয়ত আবার। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কতো কথাই না বলত ওরা আগে।

মেঘ-ঢাকা আকাশ। রবীন্দ্রনাথ তাকে গম্ভীর বলেছেন। কবির দৃষ্টি আলাদা। তাঁর চাইতেও প্রকৃতির সঙ্গে মনের যোগাযোগ মেয়েদের হয়ত বেশি। মন এম্নিতেই ভালো নয় সুপ্রীতির। তার উপর মেঘের ছায়া-রঙ লেগে মনে ভালো-না-লাগাটা যেন গাঢ় হয়ে উঠেছে। ভাস্বতীর অপেক্ষায় থেকে সুপ্রীতি বাড়ির কথা ভাবছিল। ছোট ভাই লিখেছেঃ 'দিদি, তুমি ছ'মাস বাড়ি আসছ না। এ ছুটিতে নিশ্চয় আসবে।' যেতে কি ইচ্ছা করে না সুপ্রীতির? কিন্তু গেলেই ত মা সেই মামুলি কথাগুলো বলতে সুরু করবেনঃ 'আমি না মরলে তুই আর বিয়ে করবিনে।' 'আমার মৃত্যুর কারণও তুই-ই হবি, বুঝলি?' এসব শোনার চাইতে দূরে থাকাই ভালো।

ভাস্বতী এসে দেখল, সুপ্রীতি দিনটার মতোই থমথম করছে। তার পাশে বসে বললেঃ "বাড়ি থেকে কোনো জরুরি খবর এসেছে তোমার?"

"না।" থামল সুপ্রীতি : "তোমাকে কথাটা বলব কি না এতো-দিন ভেবেছি। আজ মনে হল, বলাই উচিত।" এইটুকু বলেই যেন সে হাঁপাল একবার।

ভাস্বতী হাসতে চাইল কিন্তু পারল না। আজকের আবহাওয়া-টাই যেন হাসির নয়।

"আমাকে তুমি হয়ত যাচ্ছে-তাই ভাবছ, তা-ই না" ঠোঁট টিপতে সুরু করলে সুপ্রীতি।

"কেন?" দুঃখিত গলায় বললে ভাস্বতী।

"আমি আসাতেই শমীনবাবুর সঙ্গে তোমার সম্বন্ধটা খারাপ হয়ে গেছে।"

"খারাপ? এ সম্বন্ধ খারাপ হয় না কি?" জোর করে হাসল ভাস্বতী কিন্তু মনে-মনে বুঝিবা সে শিউরে উঠল।

সুপ্রীতি ভাস্বতীর হাত নিজের মুঠোতে নিয়ে বললে : "সত্যি বলছি ভাস্বতী—শমীনবাবু আমার দিকে বড়ো বেশি ঝুঁকে পড়েছেন, যা আমার মোটেও ভালো লাগছে না।" ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যালে যাবার সন্ধ্যা ও রাত্রিটা মনে এনে সুপ্রীতি যেন পাথরের মতো হয়ে গেল।

মুখ নীচু করে রইল ভাস্বতী। সে কি বুঝতে পারেনি শমীনের অনুচিত আচরণ! কিন্তু কী বলবে সে শমীনকে? কিছু বলার সাহসই যেন তার নেই। আজ, এখন, সেই অসহায়তায়ই বুঝিবা তার চোখ ভিজে উঠল।

সুপ্রীতি ভারী গলায় বললে : "জানো ভাস্বতী, আমি এখানে থাকলে, তোমার সর্বনাশ আমার সর্বনাশ হবে।"

ছলছল চোখে ভাস্বতী তাকাল সুপ্রীতির মুখে। বিষাদ-কালো সে মুখ।

ঝিরঝিরে বৃষ্টি হচ্ছিল বাইরে। এই যেন ব্যথা ঢেলে দেবার সময়। ভেজা গলায় ভাস্বতী বললে : "তোমার সঙ্গে এক বাড়িতে থাকব, সে আমার কতোদিনকার সাধ। বাবা থাকতেও মাঝে মাঝে

মনে হত, বাড়ি ছেড়ে 'সানি কটে' গিয়ে থাকি। তোমাকে কাছে পেয়ে আমার কী আনন্দ! উনি যদি অন্যায় করতে থাকেন তবে যে আমি তোমাকে হারাব।"

"ওঁকে হারানোর চাইতে আমাকে হারানো ভালো।"

"উনি যদি হারিয়ে যেতে চান, তুমি না থাকলেও হারাবেন।"

"কিন্তু আমি কেন তোমার তুঃখের কারণ হব?"

"তুমি হবে না, তা আমি জানি আর তাই ত আমার ভয় নেই। তুমি যে তুঃখিত হয়েছ, তা-ই আমার তুঃখ।"

"আমি মানুষকে ঘৃণা করিনে, ভাস্বতী! কিন্তু শমীনবাবুকে একদিন মনে-মনে ঘৃণা করেছি।"

ভাস্বতী আবার মাথা নীচু করলে। কতো নীচুতে নেমেছে শমীন কে বলবে? সুপ্রীতি বলবে না। সে-ও জানতে চাইবে না। কিন্তু যতোটুকু জেনেছে তাতেই তার চোখ অন্ধকার হয়ে গেল।

ভাস্বতীর হাতে হাত বুলোয় সুপ্রীতি, বলে: "আমি ভাবতে পারি, ভাস্বতী, লুকিয়ে যে তুমি কতো কেঁদেছ। আমি চলে গেলে তোমার কান্না থাকবে না। আগেকার দিনগুলো আবার ফিরে পাবে তুমি।"

ভাস্বতী মুখ না তুলে বলে: "তুমি চলে গেলে আমার তুঃখই বাড়বে শুধু।"

"আমাকে তুমি কী করতে বলো?"

"আমি?" মুখ তুলল ভাস্বতী: "আমি কী বলব?"

তু'জনই অসহায়। বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে থাকে। পথে যেন আটকে পড়েছে। ঘরে ফিরবার উপায় নেই।

কাজেই কিছুই ওরা স্থির করতে পারে না। সুপ্রীতির 'সানি কটে' ফিরে যাবার সঙ্কল্প কেমন যেন শিথিল হয়ে আসে মনে। যে লজ্জায় আর ঘৃণায় এ সঙ্কল্প সে করেছিল, ভাস্বতীর কাছে প্রকাশ করে তার ভারটা যেন অনেক হাল্‌কা হয়ে গেছে। ভাস্বতী যদি

শমীনকে জানায়, সুপ্রীতির অসন্তোষের কথা—তাহলে হয়ত সে রাত্রির ঘটনা আর কোনোদিন ঘটবে না। সুপ্রীতির ভদ্রতার শালীনতার সুযোগ নিতে আর আসবে না শমীন।

ভাস্বতী কাঁদছে। কান্নায় হাল্কা করে নিচ্ছে মন। তাছাড়া কী করবে? শমীনের মুখোমুখি সে দাঁড়াতে পারবে না। বলতে পারবে না, তোমার এ অন্যায়। কোনোদিন বলেনি বলেই পারবে না।

"শমীনবাবুকে এ-কথাটা বলো ভাস্বতী, আমাদের দু'জনকে দুঃখ দেবার তাঁব অধিকার নেই।" সুপ্রীতি বললে।

॥ পঁচিশ ॥

ভাস্বতী আর সুপ্রীতির সঙ্গে একটি সুন্দর বিকেল কাটিয়ে এলো নিরঞ্জন। ওরা জানতে চেয়েছিল, একা কেন, গীতা কোথায়? গীতা রাত্রির রান্নায় ব্যস্ত। ঝির রান্নায় উত্যক্ত হয়ে নিজেই একেক দিন রান্নায় যায় গীতা। নিরঞ্জন অবশ্যি ভেবেছে, রান্নাটা গীতার অজুহাত। নীরেন সোমের সঙ্গে ছাড়া সে বেরোয় না আজকাল।

বাড়ি এসে নিরঞ্জন সেই একই দৃশ্য দেখতে পেলে। নীরেন সোম বসে পাইপ টানছেন, গীতা তার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। কী যে এতো কথা বুঝতে পারেনা নিরঞ্জন। ইতিমধ্যে ত একদিন, একটা পুরোদিন, গীতা নীরেন সোমের ফ্ল্যাটে কাটিয়ে এলো। তাতেও কি কথা ফুরোল না?

নিরঞ্জনকে দেখে ওরা কেউ চুপ করতে ব্যস্ত হল না। নীরেন সোম পাইপ নামিয়ে বললেন: "এসো নিরঞ্জন। ছুটিতে কোথাও যাবার কথা হচ্ছে!"

চুপচাপ নীরেনের পাশে বসল নিরঞ্জন। তার মনে পড়ছিল: এম্নি ছুটিতে বাইরে বেরিয়েই ত গীতার সঙ্গে তার আলাপ, পরিচয়। কী তীব্র প্রতীক্ষায় দিনগুলো কাটত তখন! রোজ ভোরে মনে হত জীবনের সব চাওয়া বুঝি আজকের দিনে দেখা দেবে! প্রতিটি সূর্যোদয় রঙীন, প্রতিটি সূর্যাস্ত রঙীন। হরিদ্বারের স্বচ্ছ গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে গীতা প্রথম বলেছিল: তোমায় ভুলব না। তেমন মুহূর্ত আর আসবে না। গীতার সেই স্বচ্ছ মনের ছবি কোনোদিন আর দেখবে না নিরঞ্জন।

গীতা নিরঞ্জনকে বললে: "যাবে পুরী?"

"পুরীর দুপুরের সমুদ্র যেন একটা ফুল-ফোটা কাশবন!" নীরেন

সোম বলতে সুরু করেন : "হোটেলের বারান্দা থেকে সেই সবুজ-শাদা দৃশ্য দেখা জীবনের একটা উজ্জ্বল অভিজ্ঞতা !"

"সমুদ্র এমন একঘেয়ে যে দু'বার দেখতে ইচ্ছে করে না।" মৌন ভাঙে নিরঞ্জন।

"তার মানে তুমি গ্রীণ-এজ পার হয়ে গেছ!" নীরেন সোম বলেন।

"তা ত বটেই।"

"সব বয়েসীরাই পুরী যায়—চলো।" গীতা বলে।

"না-হয় দারুব্রহ্মই দর্শন করবে।" নীরেন সোম হাসেন।

নিরঞ্জন কিছু বলে না। বিরক্ত হয়। কিন্তু তা প্রকাশ করতে পারে না। নীরেন সোমকে ক্ষুণ্ণ করবার সাহস তার নেই।

"আমি ডাল-টা দেখে আসছি—তোমরা কথা বলো!" গীতা চলে যায়।

পাইপ টানতে সুরু করেন নীরেন সোম অনন্যমনা হয়ে। তারপর একসময় বলে : "তোমাকে দেখলে শীতের গাছের কথাই মনে আসে, নিরঞ্জন!"

"তা-ও না।" হাসির একটা পাণ্ডুর ছায়া নিরঞ্জনের মুখে ভেসে ওঠে : "শীতের গাছে বসন্ত আসে। আমি মরা গাছ।"

"সে কী? আমি ত এখনো ডাইলান টমাসের সে ভিগার অনুভব করি। The force that through the green fuse drives the flower/ Drives my green age.—"

"আমার ফ্লাউয়ারিং সিজন চলে গেছে, স্যর।"

"One can never tell"

নিরঞ্জনের যন্ত্রণা যে নীরেন সোম বুঝতে পারেন না. তা নয়। কিন্তু এ-যন্ত্রণার জন্যে তিনি নিজেকে দায়ী করেন না। কারণ, কোনো-দিনই তিনি ভাবেন না গীতা নিরঞ্জনকে ডিভোর্স করে তার সঙ্গে বসবাস করতে আসবে। তিনি তা চানও না। সংসারী হতে তিনি

নারাজ। তামাক, বই আর মাঝে-মাঝে মেয়েদের সঙ্গ—এই তাঁর কাম্য। নিরঞ্জন যদি তাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে থাকে তাহলে সে ভুল করছে। নিরঞ্জনের যন্ত্রণার বিস্ফোরণ যাতে না হয় তার দিকেও দৃষ্টি আছে তাঁর। নিরঞ্জনকে তিনি ভালোবাসেন, গীতার সঙ্গে পরিচিত হবার পর থেকে আরো বেশি।

"আমাদের শহরের জীবনটাই,—" নিরঞ্জন আস্তে আস্তে বলে : "যেন একটা ক্রুদ্ধ জানোয়ারের থাবার নীচে মৃত্যুর প্রতীক্ষা!"

নীরেন সোম হাসেন : "খুব জোরালো একটা কথা বললে ত! তা-ই যদি মনে হয়, চলো না বাইরে—যেখানে শহর নেই তেমন জায়গায়। ধরো সাঁওতাল পরগণায়—অষ্ট্রিক কালচারে।"

গীতা এলো, বললে : "মাছ হবে এখন। দাঁড়াতে পারব না। কী ঠিক করলে তোমরা?"

"সাঁওতাল-পরগণা কেমন মনে কর তুমি?" নীরেন সোম জানতে চাইলেন।

"খুব ভালো।" গীতা নিরঞ্জনের দিকে তাকালে : "যাবে?"

"তোমরা যাও, আমি যাবো না।"

"তুমি না গেলে যাওয়া হবে না।" গীতা রান্না ঘরে চলে যায়।

খানিকক্ষণ চুপচাপ ধোঁওয়া উদ্গীরণ করে নীরেন সোম বলেন : "থাক্, বাইরে যাওয়া না হলে একদিন বোটানিক্সে গিয়ে একটা সবুজ দিন কাটানো যাবে!"

নিরঞ্জন হাসে : "এই মরা গাছকে জ্যান্ত গাছের বাগানে নিয়ে কী লাভ?"

"চন্দন গাছের সঙ্গে থাকলে অন্য গাছও চন্দন হয়! তুমি গীতার মতো এমন একটি সজীব মানুষের সঙ্গে থেকেও মরে গেলে কেন, ভাবছি।"

নিরঞ্জন কিছুই বলে না, ভাবে : একদিন ধূমকেতুর মতোই গীতা তার কাছে এসেছিল, ধূমকেতুর মতোই এখন দূরে সরে গেছে —গ্রহের মতো পথ তার নয়, ধূমকেতুর মতোই পথ—এখন সে

নীরেনের কাছাকাছি—তা-ও থাকবে না, থাকতে পারে না—আবার আসতে পারে সে নিরঞ্জনের কাছাকাছি। এলেও বা কী? তাকে নিয়ে সৌরমণ্ডল তৈরী হবে না। গীতার এই সজীবতার কী মানে হয়? তা বন্ধ্যা।

পাইপ ঝেড়ে নীরেন সোম ডাকেনঃ "গীতা, এক কাপ চা খাওয়ালে না?"

"চা খাননি?" ব্যস্ত হয়ে উঠে যায় নিরঞ্জন: "আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

একা হয়ে নীরেন সোম ভাবেন: নিরঞ্জন নিজেকে এমন দূরে সরিয়ে নিচ্ছে কেন? সেকেলে বোকামি! একটি মেয়েকে কি দু'জন পুরুষ ভালোবাসতে পারে না? গীতা যে নিরঞ্জনকে একটু কম ভালবাসে তা ত নয়? দু'টো বিন্দুকে কেন্দ্র করে তার জীবনের পথ তৈরী হচ্ছে। পথ যে শুধু বৃত্তাকারেই হবে, তার কি কথা আছে?" ইলিপ্‌টিক্যাল পথ মেনে নিলেই ত নিরঞ্জন সুখী হতে পারে। ভালবাসা ত একটা কাজ। দু' কলেজে যেমন পড়ান অনেক প্রফেসর—এ-ও তেম্নি। তাছাড়া, বিকেন্দ্রীকরণই যখন একালের অর্থনীতির কাম্য, মানুষের জীবনেও তা হবে না কেন?

নীরেন সোম সুখী। পোষ্টগ্র্যাজুয়েটের যে মেয়েটি—স্বপ্না সেন--তাঁর কাছে পড়তে আসে, তাকে ভালোবেসে তিনি যেমন সুখী, গীতাকে ভালোবেসেও তেম্নি। এর আগে যে মেয়েদেব ভালোবেসেছিলেন, তাঁদের নিয়েও এ ধরনেরই সুখী ছিলেন তিনি। স্বপ্নাকে তিনি বলেছেন: Our souls are love and a continual farewell। এই তাঁর রক্তের কথা। আত্মার কথা।

আঁচলে হাত মুছতে মুছতে গীতা এলো: "রান্নার ঝামেলায় ভুলেই গিয়েছিলাম আপনার চায়ের কথা। মালাইটা হয়ে গেলেই করে দিচ্ছি।"

"চিংড়ি? ও ত চায়ের সঙ্গে জমবে ভালো।"

হেসে চলে যায় গীতা। পাইপে আবার তামাক ভরে নেন নীরেন সোম।

॥ ছাব্বিশ ॥

'সানি কট' প্রায় খালি। তিন ঘরে মাত্র তিনজন। সুলেখা, কৃষ্ণা আর তৃপ্তি। এমন নিঝুম যে সুপ্রীতি এসে উদ্বিগ্নই হয়ে পড়ল। সুষমাদির ঘরেই গেল সে প্রথম। তিনি নেই। বই-এর উপর উপুড় হয়ে ছিল কৃষ্ণা। মুখ তুলে বললে : "এসো।"

"সুষমাদি কোথায় ?" সুপ্রীতি সুষমাদির কাছেই এসেছে।

"সিউড়ি। আসবেন দু'একদিনের মধ্যে। বোসো না!"

"তোমার পড়ার ব্যাঘাত হবে!"

"পড়া ত আছেই সবসময়। সবসময় তোমাকে পাই কোথায় ?"

"লতিকা-তৃপ্তি-সুলেখাদি এঁরা নেই ?"

"লতিকা বাড়ী গেছে। আর সব আছেন!"

"পড়ায় তোমার কী নেশাই না হয়েছে কৃষ্ণা, আমার যদি এমন হত!"

"'সানি কটে'র সবারই এখন তা ই। তা জানো না। সুলেখাদির ত থিসিস আছে। তাছাড়া এলিঅট-অডেন তিনি আমাকে পড়িয়ে দিচ্ছেন! লতিকাও হিষ্টরিতে এম-এ দেবে। ওর ছোড়দার তা-ই ইচ্ছে।"

"খুব ভালো।"'

"তুমিও বাংলায় একটা ডিগ্রী নিয়ে নাও, সুপ্রীতি!"

"বাংলায় হোক, সংস্কৃতে হোক নিতেই হবে হয়ত কোনোদিন।"

"টিচিং লাইনে থাকলে কি আর পড়ার শেষ আছে!"

হেসে উঠল সুপ্রীতি : "ঠিক উল্টো বলছ তুমি। টীচাররাই ত সব চাইতে কম পড়েন।"

জ্যৈষ্ঠের রুপোলি দুপুর। মেঘ নেই। ঝকঝকে রোদ।

"কিন্তু 'সানি কটে'র নাম সার্থক হতে চলেছে সুপ্রীতি—" খুশী খুশী মুখে বললে কৃষ্ণা: "অবশ্যি, সুলেখাদির জন্যেই। ডক্টরেট তিনি নিশ্চয় পাবেন। সুলেখাদির উৎসাহেই লতিকার লেখাপড়ার দিকে মন গেছে। ভাবতে পারো, বসে বসে ইংরেজি কবিতা পড়ত সে।"

"তুমিও ত 'সানি কটে'র এক টুকরো রোদ।"

"আমার আর বিদ্যাবুদ্ধি কতোটুকু? সুষমাদি-সুলেখাদির কাছে আমি কী?"

"মহাভারত থেকে যখন নামটা নিয়েছ তখন তোমারও ভাবা উচিত: 'কা নু সীমন্তিনী মাদৃক্ পৃথিব্যামস্তি কেশব!'"

হাসতে থাকে কৃষ্ণা বলে: "যা ভেবেছিলাম দেখছি তা নয়। পারিবারিক আবহাওয়ায় গিয়ে তোমার মৃত্যু হয়নি। ঠিক তেম্নি আছো।"

খানিকক্ষণের জন্যে চুপ করে থাকে সুপ্রীতি। তারপর বলে: " 'সানি কটে' আমার রেসারেক্‌সনও ত হতে পারে।"

"আসবে তুমি এখানে?"

"ভাবছি।"

"তৃপ্তি চলে যাবে। এসো। ওর ঘরে থাকতে পারবে।"

"কোথায় যাবে তৃপ্তি?"

'জানিনে। বলে, চাকরিই না কি ছেড়ে দেবে।"

"তৃপ্তি আছে ঘরে?"

"আছে। এলাচ ছেড়ে পান ধরেছে তৃপ্তি।"

"পানাসক্ত?" হেসে সুপ্রীতি বলে: "যাই. ওর সঙ্গে কথা বলে আসি।"

তৃপ্তি বিছানায় টান-টান শুয়ে পান চিবুচ্ছিল। সুপ্রীতি ঘরে এসে বল্‌লে: "দিব্যি গিন্নীর মতো দেখাচ্ছে ত তোমায়!"

"ভাস্বতীর গিন্নীপণা দেখতে দেখতে সে-ছবিই বুঝি সব জায়গায় দেখতে পাচ্ছ আজকাল?"

"নতুন কোনো ছবি ত দেখাতে পারছ না।" সুপ্রীতি চেয়ার টেনে বসল।

"দেখবে।" চোখে হাসি ছিটোল তৃপ্তি।

"তা-ই নাকি ? কবে পর্যন্ত তা আশা করা যায় ?"

"অন্তত তুমি খবর পাবে। কারণ তুমি সব জানো।"

কী জানে সুপ্রীতি ? ও, তৃপ্তির স্কুল-কলেজের দিনের অভিজ্ঞতা। যা সে ঘুমুতে না পেরে তাকে বলেছিল। তৃপ্তিকে মনে পড়েছিল সুপ্রীতির সেই রাত্রিতে যখন শমীন তার মুখের উপর মুখ নামিয়েছিল। যেন তৃপ্তিকে ঠিক বুঝতেও পেরেছিল সেদিন কিন্তু সে-তৃপ্তির মনে কি উল্টো হাওয়া বইছে এখন ?

"তোমার সেই দাদা বিদেশ থেকে ফিরে এসেছেন ?" সুপ্রীতি জানতে চাইল।

"এই ত সাতদিন হল।"

"তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে ?"

"দেখা হয়েছে। বীডন স্ট্রীটের বাড়িতে। সেখানে ত কোনো কথাই হ'ল না। ভাই-বোনরা ওঁকে ঘিরে ছিল।"

"কথা হল ত কোথাও ?"

"হ'ল। আউট্রাম ঘাটে।"

"যাক্ ট্রামে-বাসে যে নয়। তাহলে অন্তরঙ্গ কথাই হল নিশ্চয় !"

"সুরুতেই গিয়ে আমার শেষ হবে, আমি বুঝতে পারছি সুপ্রীতি !"

"বিয়ে করবে তোমরা ?"

"এক সঙ্গে থাকতে হলে কি বিয়ে করতেই হয় ?"

"তা কেন ?"

"প্রথম যে মেয়েদের শরীর-সচেতন করে তোলে, তাকে ভুলে যাওয়া মুস্কিল—না সুপ্রীতি ?"

"ভাবিনি।"

"ভেবেছিলাম টীচিং লাইনে এসে আমার আমূল পবিবর্তন হয়ে যাবে—কিন্তু হ'ল না।"

"ফিল্ম-লাইনে যাবে ?"

"না। উনি বললেন যেতে। একটা ছবিতে না কি ক্যামেরার কাজ করবেন—সে ছবিতে চান্স নিতে। আমি রাজি না!"

"জানো, চাকরি করা মেয়ে ম্যান-ইটার বাঘ। সে বাঘের যেমন মানুষের রক্ত ছাড়া চলে না, একবার চাকরির স্বাদ পেলে মেয়েদেরও চাকরি ছাড়া চলে না। কাজ তোমাকে করতেই হবে, না-ই বা করলে টীচারি।"

"জীবন শান্তি খোঁজে, টাকা খোঁজে না সুপ্রীতি।"

"টাকা ছাড়া সে-শান্তি কি হয়—যখন অর্থনীতিই সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছে আমাদের জীবনে।"

তৃপ্তি উঠে বসে। সমস্তটা ভবিষ্যৎ কে ছকে রাখতে পারে? এই মাত্র ভেবেছে সে, দাদার সঙ্গে এক বাড়িতে গিয়ে থাকবে, চাকরি করবে না। দুর্নীতির দায়ে যদি তার টীচারি যায়, সে কি ভালো? তার চাইতে আগেই কাজ ছেড়ে দাও। তা-ই বুঝেছে তৃপ্তি, তা-ই ভেবে রেখেছে।

সুপ্রীতি তৃপ্তির মুখে তাকিয়ে বললে: "যা-ই হোক, তোমাকে খুব নির্ভার দেখাচ্ছে, তৃপ্তি!"

"তুমি নাকি নির্বাক হয়ে উঠেছিলে মাঝখানে—লতিকা বলছিল।"

"মাঝে-মাঝে চুপ থাকা ভালো—তা-ই না?" সুপ্রীতি নিজেকে খুলে ধরতে চাইল না তৃপ্তির কাছে। সে যে ভাস্বতীর ওখানে আর থাকবে না, চলে আসছে 'সানি কটে' তার কোনো আভাষই দিতে চাইল না সে কথায়।

"ভালো। কিন্তু ভাবছি—" তৃপ্তি হাসতে লাগল: "তোমার জীবনেও কোনো ঘটনা ঘটল না কি!"

হাসিতে যোগ দিল সুপ্রীতি: "নিজের ভাবনা চুকিয়ে পরের ভাবনা ধরেছ বুঝি?"

॥ সাতাশ ॥

দুপুর বেলা সুপ্রীতি মাঝে-মাঝে 'সানি কটে' যায় কিন্তু সকাল-বিকেল ভাস্বতীর সঙ্গে ঠিক আগেকার মতোই গল্প করে, হ'সে, পিকলুকে ছড়া মুখস্থ করায়। ক্বচিৎ কখনো কথায়-কথায় ভাস্বতীকে বলে: "আমি চলে গেলে মন খারাপ করো না, ভাস্বতী! আমি ত মরে যাচ্ছিনে। থাকবোই।" খারাপ লাগে ভাস্বতীর কিন্তু সুপ্রীতির যাবার জন্যে সে মনে-মনে তৈরী হয়।

এম্নি একদিন সকালে চায়ের টেবিলে সুপ্রীতি চায়ে চুমুক দিয়ে বললে: "আমি আজই চলে যাচ্ছি!"

ভাস্বতী সুপ্রীতির মুখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে চোখ নামিয়ে নিল।

শমীন একটু চমকে উঠে বললে: "কোথায়?"

"যেখান থেকে এসেছিলাম সেই 'সানি কটে'।" একটু হাসল সুপ্রীতি।

এ কি তার ব্যবহারের প্রতিবাদ? ভাবলে শমীন। এই প্রথম ভাবলে। এই মুহূর্তের আগে পর্যন্ত সে মনে করেছে, সুপ্রীতির সঙ্গে সে যা করতে চেয়েছে তাতে সুপ্রীতির আপত্তি নেই। হয়ত তাই সুপ্রীতির শয্যাসঙ্গী হবারও স্বপ্ন দেখেছে শমীন। সুপ্রীতির পক্ষ থেকে কোনো বাধাই সে আশঙ্কা করেনি। আজ সুপ্রীতির কথায় সে যেন নিজের অপরাধের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। কিন্তু তবু বলতে পারল সুপ্রীতিকে: "এখানে কিছু অসুবিধে হচ্ছে?"

উত্তর দিলে ভাস্বতী: "যারা স্বাধীন, সুন্দর জীবন চায় তারা, পরিবারের আবহাওয়ায় থাকতে পারে না।"

শমীন ভেবে নিল, ভাস্বতীও হয়ত তার অপরাধের কথা জানতে পেরেছে। সুপ্রীতিও ভাস্বতীর কাছে কিছু গোপন রাখেনি। কিন্তু

এমন ত ভাবেনি সে কখনো সুপ্রীতিকে। ভেবেছে, তার জন্যে খানিকটা ভালোবাসা আছে সুপ্রীতির। মেয়েদের ভালোবাসাটা ভান। সব মেয়েরই। গম্ভীর হয়ে গেল শমীন।

কেউ আর কথা বললে না খানিকক্ষণ। চা'য়ে অপূর্ব মনোযোগ দেখা গেল সবার। শুধু পিকলু দুধ খাওয়া শেষ করে বললেঃ "প্রীটি, তুমি আমায় ছবি দেখাতে নিয়ে যাবে না?"

"এক্সিবিশানে—" পিকলুর পিঠে হাত বুলিয়ে বললে সুপ্রীতিঃ "নিশ্চয় নিয়ে যাব। হোক আবার।"

"আমায় আরো ছবি এঁকে দেবে?"

"দেব। হাতীর ছবি।"

"হেঁ, হেঁ হাতী! আমাকে জু-তে নিয়ে যাবে না?"

"তুমি ত সিংহির ডাকে ভয় পেয়েছিলে, আর না।"

একটা আশ্চর্য কথা বললে পিকলুঃ "তুমি যে চলে যাচ্ছ, ভয় পেয়ে?"

"কোথায় যাচ্ছি?" সুপ্রীতি হেসে উঠলঃ "রোববার-রোববার আসব তোমাকে দেখতে। ছড়া শুনতে।"

কোনো ভনিতা না করে শমীন উঠে গেল। ভাস্বতী পিকলুকে বললেঃ "যাও, এখন খেলা করো গে।"

পিকলু চলে গেল।

ভাস্বতীকে একা পেয়ে সুপ্রীতি বললেঃ "তোমাকে আমি ভালোবাসি বলেই এখানে আর থাকব না। তুমি অন্য-কিছু ভেবো না ভাস্বতী?"

ভাস্বতীর জিব নড়ছে কিন্তু তা যেন কথা বলবার জন্যে নয়, ব্যথার যে একটা পিণ্ড গলা থেকে উঠে আসছিল তা ঠেলে দেবার জন্যে।

"মুখের হাসি তোমার চলে গেছে, ভাস্বতী। আবার তুমি হাসি-খুশী হতে পারবে।" গাঢ় গলায় বললে সুপ্রীতি।

চোখে অনেকগুলো পলক ফেলে, অন্যদিকে তাকিয়ে ভাস্বতী বললেঃ "কেন ভুল করছ, বিয়ে করলেই দুজনের মন এক হয় না।"

"কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, আমি এসেই তোমার আর শমীনবাবুর মধ্যে ব্যবধান তৈরী করে গেলাম!"

"ব্যবধান থাকেই। গীতার বেলায় কী হয়েছে, জানো ত?"

"নিরঞ্জনবাবুর কথায় খানিকটা আঁচ করেছি। তাছাড়া একদিন দেখলাম, হাজরার মোড়ে, গীতা আর নীরেনবাবু আলিপুরের ট্রাম নিলেন!"

"মেয়েদের স্বাভাবিক সংযম গীতার নেই।"

ছেঁড়া-খোঁড়া মেঘ ছিল আকাশে। তবু রৌদ্র আছে। মোটামুটি পরিষ্কার সকাল।

সুপ্রীতি স্বাভাবিক মেজাজে এসে বললেঃ "তৃপ্তি চাকরি ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তার ঘরেই থাকব আমি—লতিকার সঙ্গে। ভারি মিষ্টি মেয়ে লতিকা।"

"তৃপ্তি কোথায় যাচ্ছে?"

"তার অ্যাম্বিশান, ফিল্ম-প্রডিউসার হবে। এসব ছবি নয়, তার ছবিতে হবে নাকি মেয়েরা দুর্দান্ত সাহসী, যা দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায় পুরুষরা। কেউ চ্যানেল সাঁতরাবে, কেউ প্যারাসুট নিয়ে লাফ দেবে—হিমালয়-অভিযাত্রী বা কস্‌মোনট। সাধারণ নটনটী নয়।"

ভাস্বতী হেসে বলেঃ "ভালোই ত!"

নিতাই এলো চায়ের বাসন-কোশন নিতে। ভাস্বতী বললেঃ "বাবুর কাছ থেকে টাকা নিয়ে বাজারে চলে যাও। গঙ্গার ইলিশ আনবে। চেনো ত? পেট মোটা আর ল্যাজের দিকটা খুব সরু। শীগগীর। মাছ আমি রান্না করব আজ।"

"দোহাই তোমার, এ-শরীর নিয়ে রান্নায় যেয়ো না, তুমি!" সুপ্রীতি বলে।

"এ শরীর থাকলেও বা কী, গেলেও বা কী?"

"কেন তুমি নিরাশায় ভুগছ—বলো ত? হাজার বছর আগেকার বাঙালীর মতো 'মহাসুখ'ই হচ্ছে শমীনবাবুর জীবন-দর্শন। তাঁর সঙ্গে

থেকে তুমি শুধু অসুখে ভুগবে!" সুপ্রীতি হাসে: "ওঠো, চলো আমার ঘরে।"

ওরা ওঠে। সুপ্রীতির ঘরে এসে ভাস্বতী বলে: "কাল এই ঘরটা দেখে কী খারাপই না আমার লাগবে।"

"চোখের খুব কাছাকাছি কাউকে ভালো দেখা যায় না, ভাস্বতী, একটু দূরে সর্‌লেই স্পষ্ট দেখা যায়।"

"দেখবে, আমি আরো রোগা হয়ে যাব।"

"না-না। প্রায় ত সেরেই উঠেছ তুমি। রোজ যেম্নি বেড়াতে যাও, তেম্নি যাবে। শরীর সারতে ক'দিন?"

"উনি হয়তো ভাবলেন, আমিই তোমাকে সরিয়ে দিচ্ছি!"

"কেউ যদি মিথ্যা ভাবেনই, তুমি তার কী করবে?"

"তবু তুমি সুখী হলে আমার শান্তি।"

"তেমনি আমারও। আমি প্রথম তোমাদের যেমন দেখতে পেয়েছিলাম, তেমন যেন দেখতে পাই মাঝে-মাঝে এলে।"

"পুরুষের সঙ্গে তুমি থাকোনি সুপ্রীতি! তাদের যে আমাদের উপর কতো দাবী তা তুমি জানো না!"

সুপ্রীতি চুপ করে যায়। সত্যি, একটি বিবাহিত মেয়ের মন সে কতোটুকু জানে; কতটুকু বা বুঝতে পারে? যন্ত্রণা আছেই। গীতারও আছে, ভাস্বতীরও আছে। 'সুখী দম্পতী' কি কোনো কালে সত্যি হতে পারে? শরীরের গঠনেই যখন মেয়ে পুরুষ আলাদা, তাদের সবকিছুই আলাদা হতে বাধ্য।

"তোমারও যে দাবী থাকতে পারে" সুপ্রীতি দুঃখিত মুখে বলে: "তা শমীনবাবুকে বুঝতে দিও, ভাস্বতী। নিজেকে খোয়ালে তুমি সব খোয়ালে।"

"যাই আমি—" ভাস্বতী বল্‌লে: "উনুনটা দেখে আসি। তুমি ত ছোলার ডাল ভালোবাসো, তা-ই করব আজ।"

"ছোলার ডাল চড়ালে আজ আর খেয়ে অফিসে যেতে হবে না শমীনবাবুকে।"

"হোটেলে লাঞ্চ করবেন। হোটেলে খাওয়ারই ত সখ।" অম্লান মুখে বলে যায় ভাস্বতী।

॥ আটাশ ॥

এখনকার পৃথিবীতে পবিত্রতা কথাটা হয়ত হাস্যকর। তবুত মন অনেক অন্ধকার গলিঘুঁজি ঘুরে হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে শুচি হয়ে ওঠে। এখনও। এখনও, যখন আমাদের জীবন চলেছে নেহাৎ খেয়ালি শূন্যতায়।

বিকেল। কিন্তু এ-বিকেল তেমন নয়, যে বিকেলে দিল্লী থেকে ভাস্বতীর শেষ চিঠি পেয়েছিল সুপ্রীতি। নীল নয় আকাশ। দিগন্তে কালো মেঘের বলয়। উপরে ছড়ানো-ছিটানো রোদ-লাগা টুকরো শাদা মেঘ। শাদা। কেমন যেন শুভ্র, পবিত্র। সত্ত্বগুণের রঙ। শান্তির প্রতীক। শাদা রৌদ্রের বিকেলে 'সানিকটে' ফিরে এলো সুপ্রীতি। মন যেন তার পবিত্র হয়ে গেল।

তৃপ্তি আর লতিকার ঘর খালি। সুপ্রীতি সেখানেই থাকবে। কৃষ্ণা বেরিয়ে এলো অভ্যর্থনায়, বললে: "এসো। সুষমাদি আসছেন এখুনি।"

"তুমি পড়ছিলে?"

"রোমান্টিকদের! পরীক্ষার জন্যেই নয়। এসব কবিতা মনটাকে যেন মুক্ত আকাশে নিয়ে যায়!"

"এমন দিনে। যখন মনে হয়: মন মোর মেঘের সঙ্গী!"

"সুলেখাদি তোমার কথা বার বার জিজ্ঞেস করছিলেন।"

"কেন?"

"তোমাকে জিজ্ঞেস করবেন, কালিদাসে ইমেজ আছে কি না!"

"তখন কি তার ব্যবহার ছিল? তবু হয়ত কুমারসম্ভবে পাওয়া যাবে। দেখতে হবে খুঁজে।"

ঠেলা-ওয়ালা মালপত্র আনতে সুরু করে। ওগুলো টানাটানি করতে থাকে কৃষ্ণা।

সুপ্রীতি বাধা দেয়ঃ "তুমি হাঁপিয়ে পড়বে কৃষ্ণা। আমিই সব করে নিচ্ছি।"

"তুমিও করো। আমাকেও করতে দাও।"

"হাঁ, পরের জন্যে ত তুমি করোই।"

আধঘণ্টা টানা-হেঁচড়ার পর সব গুছানো হল। দুজনই পরিশ্রান্ত। সুপ্রীতি বললেঃ "এক কাপ চা খেলে হয়। কী বলো কৃষ্ণা?"

কৃষ্ণা কামিনীকে ডেকে চা করতে বললে। সুপ্রীতিকে বললেঃ "তুমি যে ফিরে এসেছ, কী খুশীই না আমি হয়েছি। সমবয়সী ত কেউ নেই। গীতা, তৃপ্তি সবাই গেল।"

সত্যি ফিরে এসেছে সুপ্রীতি। ফিরতে পেরেছে। যে একটা অন্ধকারে শমীন তাকে টানতে চেয়েছিল, সেখান থেকে ছিটকে সে বেরিয়ে এসেছে। থেমে থেমে বললে সেঃ "ফিরে এসেছি। জীবনটাও ফিরে যাওয়া দরকার—মানে পাল্টে যাওয়া দরকার।"

"তাই ত বলি, সংস্কৃতে এম-এ দিয়ে দাও।"

"ভাবছি। রম্য রচনা-টচনা আমি আর পড়িনে, কৃষ্ণা। কী হবে ওসব পড়ে? জীবনটাকে রম্য করে তোলাই আসল কাজ।"

"জীবন ত তোমার রম্যই। যেখানে তুমি থাকো সবাই ভালোবাসে।"

"আমার মনে হয় জীবনে চার রকম ভালোবাসা দরকার। নিজেকে ভালোবাসা. পরিবারকে ভালোবাসা, সমাজকে ভালোবাসা, দেশকে ভালোবাসা। চতুর্বর্গ।"

"তিনটে হয়ত আমরা করি কিন্তু দেশকে আমরা চিনিই নে।"

"একটা দুর্যোগ এলে আমরা দেশ-দেশ বলে চেঁচিয়ে উঠি কিন্তু তাকে ত সত্যিকারের ভালোবাসা বলে না। গান্ধীজি যেমন বলতেনঃ 'ভারতবর্ষের সবার চোখের জল মুছিয়ে দেব।'—তাকে বলে দেশকে ভালোবাসা।"

সুপ্রীতির মুখে এ-ধরণের কথা কোনোদিন শোনে নি কৃষ্ণা। তাই অবাক হল, খুশী হল। সত্যি, খুব বড়ো একটা পরিবর্তন হয়ে গেছে

সুপ্রীতির। এ-সুপ্রীতিকে পেয়ে সুষমাদি কী যে খুশী হবেন ভাবা যায় না।

চায়ের সময়। তাই চা আসতে দেরি হল না।

সুপ্রীতি বললে: "মিনি আজকাল খুব কাজের লোক হয়ে গেছে দেখছি!"

"তুমি ফিরে এলে, তাই ত মনটা ভালো লাগছে।" কামিনী বললে।

"এখন আর কারো মন খারাপ হবে না।" কৃষ্ণা চায়ে চুমুক দিতে লাগল।

"সুষমাদি কি সুলেখাদির ঘরে?" সুপ্রীতি জিজ্ঞেস করলে।

উত্তর দিলো কামিনী: "হাঁ দিদিমণি। এই ত ওঁদের চা দিয়ে এলাম!"

"তুমি এসেছ আমি জানিয়ে এসেছি—" কৃষ্ণা বললে: "এসে যাবেন এখুনি।"

সুপ্রীতির মনে হল, সুষমাদির কথা শুনতে আজ তার ভালো লাগবে। বক্তৃতা হলেও। অবিবাহিত জীবনের আনন্দে তিনি যেমন আছেন, হয়ত আর কেউ তেমন নয়।

ওদের চা খাওয়া শেষ না হতেই সুষমাদি এলেন। শুভ্র। সার্ফে-টিনোপোলে ধোওয়া শাড়ি-ব্লাউজের শুভ্রতা যেন শুধু বাইরেরই নয় তাঁর মনের শুভ্রতারও খানিকটা ছবি।

বললেন: "সুলেখা বাড়ি যাচ্ছে, বললে, তুমি ক্লান্ত তাই এখন কথা বলবে না, রাত্রিতে কথা হবে।"

"প্রফেসার মানুষ! কথা বলতে আমার ভয় করে সুষমাদি!" সুপ্রীতি বললে।

চেয়ারে বসে সুষমাদি বললেন: "আমরা প্রফেসার, টীচার ক্লার্ক টাইপিষ্ট নার্স—এসব কি আমাদের সত্যিকারের পরিচয়? আমরা সব মানুষের মতোই মানুষ। তা-ই ত ঠিক?"

"সুলেখাদি ভালো মানুষ।" কৃষ্ণা জুড়ে দিলে।

"জ্ঞানই মানুষকে ভালো করে।" সুষমাদি বল্লেন: 'জানো সুপ্রীতি, 'সানি কট' গড়ে তোলবার পেছনে আমার মনে যে ধোঁয়াটে একটা ভাব ছিল, তা আমাদের রাষ্ট্রপতির ভাষায় যেন স্পৃষ্ট হয়ে উঠেছে: It is our duty to turn the face of the world towards the sun."

সুপ্রীতি, কৃষ্ণা দু'জনই চুপচাপ চায়ে শেষ চুমুক দিলে। তারা যেন কথা বলতে চায় না। সুষমাদিকে শুনতে চায়।

সুষমাদি কথা শেষ করেন নি। একটু থেমে আবার বল্লেন: "তোমরা 'সানি কটে' যারা আছ, আমি আশা করব, মেয়েদের আলোর সন্ধানই তারা দেবে। মেয়েদের মন বড়ো অন্ধকার। সূর্য্যের দিকে তাদের মুখ ফিরিয়ে দেওয়া দরকার।"

সুপ্রীতি নিজেকে ভাবছিল: সময় আর আমি। গত ছ'মাস আমাকে ভেঙেই চলেছে। শমীনের কাছে আমি অন্ধকারের ঢেউ, ভাস্বতীর কাছে হয়ত আলোর। এখানে ফিরে আমি আবার আমি হব। গড়ব নিজেকে। এই বিকেলের আকাশের মতোই আলো-অন্ধকারের একটি মূর্ত্তি। ঢেউ নয়। বস্তু। মনকে উজ্জ্বল করতে পারব না হয়ত সুষমাদির মতো—তবু যেন নিজেকে ভালোবাসতে পারি তেমন কিছু হয়ে উঠতে হবে আমাকে।

"তোমাদের আমি ভাবিয়ে দিলাম না কি? কথা বলছ না যে!"—সুষমাদির ঠোঁটের দু'পাশে হাসির ভাঁজ পড়ল।

"আপনি যা বলছেন তা ক'জন পারে?" কৃষ্ণা বললে: "আমরা পড়াতেই পারি, জ্ঞান দিতে ত পারিনে।"

"তাহলে পড়ানোর কোনো মানেই হয় না।" সুষমাদি বললেন।

সুপ্রীতি বললে: "আপনাকে দেখে মনে হয় আপনি কতো সুখী যা ঈর্ষা-যোগ্য!"

"সুখী? হাঁ আমি সুখী। বেঁচে থাকাটাই ত একটা সুখ। ব্রাউনিঙ যা বলেছেন।"

"শুধু বেঁচে থাকা ?"

"তাছাড়া কাজ। টীচিং-এ তুমি আনন্দ পাও না ? সব সময় ভবিষ্যতের সঙ্গে মিশছ—বছরের পর বছর নতুন ছাত্রী, নতুন মুখ আসছে—তার আনন্দ নেই ?" সুষমাদি যেন সে আনন্দ এখনও অনুভব করছেন। চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল তাঁর।

প্রৌঢ়া সুষমাদিকে দেখতে অপূর্ব সুন্দর লাগছিল সুপ্রীতির। তাঁর মুখে সে নিবিড় চোখে তাকিয়ে রইল। যেন প্রতিমা-দর্শন।

সুষমাদি আবার কথা বললেন, যেন আর কারো জন্যে নয়, নিজেকেই শোনাবার জন্যে : "যাঁরা মন্ত্রী হন, রাষ্ট্রদূত হন--সত্যিকারের দেশের কাজ তাঁরাই করতে পারেন। আমি ভাবি, আমার মেয়েদের সে যোগ্যতা কবে হবে। যেদিন হবে সেদিন আমি মনে করব আমার পড়ানোর কাজ সার্থক। মনে হবে, আমি শিল্পী—সৃষ্টির কাজে আছি। যে সৃষ্টি মহৎ। মানুষ গড়ে তোলা।"

পরিস্কার শাদা দাঁতে শুভ্র হাসি হাসলেন সুষমাদি।

সুপ্রীতির মনে হল, এক ঝাঁক শাদা পায়রা আকাশে উড়ছে।